CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

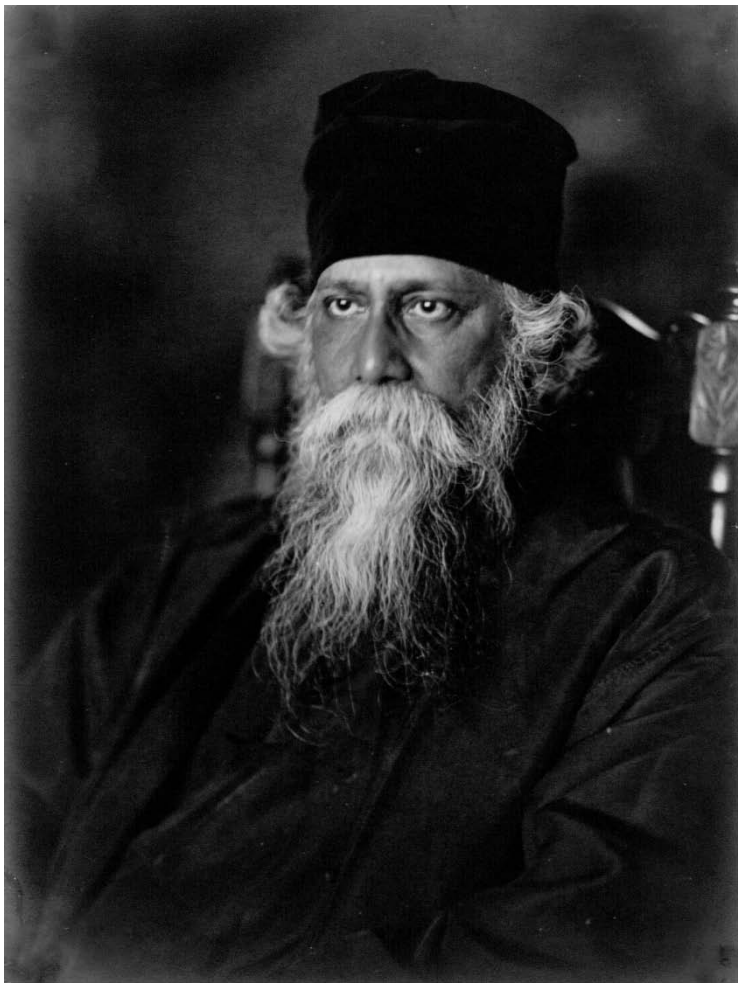

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
2	2.2	1–8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700050, Phone - (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Asru Ranjan Panda	Retired Professor	Department of Political Science, Scottish Church College, University of Calcutta
Kunal Debnath	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Madhurilata Basu	Assistant Professor	Department of Political Science, Sarojini Naidu College for Women, West Bengal State University
Pradipta Mukherjee	Assistant Professor	Department of Political Science, Hiralal Mazumdar Memorial College for Women, West Bengal State University
Dipannita Sanyal	Assistant Professor	Department of Political Science, Sir Gurudas Mahavidyalaya, University of Calcutta

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Kuntal Mukhopadhyay	Former Head and Retired Associate Professor	Department of Political Science, Raja Peary Mohan College, University of Calcutta

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

March, 2021 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata – 700 006

C.C : 2.2
Constitution and Governance in India

Contents

Unit 1.	Philosophy of the Indian Constitution: Major Shifts	1-12
Unit 2.	Federalism and state autonomy	13-22
Unit 3.	Social Justice, Patriarchy and the Indian State	23-34
Unit 4.	Politics of Defection and anti-defection Law	35-46
Unit 5.	Judicial Activism and PIL	47-51
Unit 6.	Indian Bureaucracy: Role and Neutrality	52-63
Unit 7.	Elections and Electoral Reforms in India	64-75
Unit 8.	Coalition Politics in India: Prospects and Challenges	76-85

পাঠক্রম : 2.2

Unit-1

ভারতীয় সংবিধানের দর্শন
Philosophy of the Indian Constitution : Major Shifts

বিষয়সূচী :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৌদ্ধিক প্রেরণা

- ১.৩.১ জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব
- ১.৩.২ গান্ধীজির প্রভাব
- ১.৩.৩ জওহরলাল নেহরুর উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব
- ১.৩.৪ আম্বেদকরের ভাবনা ও সংবিধানের দর্শন

১.৪ সংবিধানের উদ্দেশ্যসমূহ ও দর্শন

- ১.৪.১ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সংবিধানের দর্শন

১.৫ উপসংহার : সংবিধানের দর্শন এবং প্রধান স্থানান্তর

১.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এক এককটি পড়ে আপনি জানবেন—

১. সংবিধানের দর্শন কি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ

২. ভারতীয় সংবিধানে গান্ধীজির প্রভাব

৩. নেহরুর উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব কিভাবে ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে

৪. আম্বেদকরের ভাবনা কিভাবে ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে

৫. ভারতীয় সংবিধানের দর্শ কিভাবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে

১.২ ভূমিকা

ভারতীয় সংবধিান বিশ্বের মধ্যে একটি অন্যান্য সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র অনেকগুলো মৌলিক আইনের সমাহার নয়, ভারতীয় সংবিধান ভারতের আধুনিকতার প্রতীক। ভারতীয় সংবিধান ঐতিহাসিক, ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক সাংবিধানিক গণতন্ত্রগুলিতে আইন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনায় উত্থি প্রায় সমস্ত ইস্যু ভারতীয় সাংবিধানিক আইনের বিবর্তনে খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের সংবিধান এমন একটি অবয়ব যার মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম এবং অন্যতম বিতর্কিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সেই সনদ যার মাধ্যমে একটি প্রাক-আধুনিক সভ্যতা আধুনিকতা ও মূল সমাজ সংস্কারের পথে যাত্রা করেছিল। এটি এমন আদর্শগত এবং আইনি কাঠামো যার মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র সন্নিবেশিত। এটি এমন একটি সংবিধান যা জাতিগত, নৃকূলগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত বৈচিত্রকে অক্ষুন্ন রেখে একটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রে পরিকল্পনা করে। ভারতীয় সংবিধানে যথারীতি ভাবে একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে যেখানে ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে যার উপরি ভত্তি করে ভারতীয় সংবিধানের মৌল কাঠামা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা যেতে পারে এই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যেই সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৌদ্ধিক প্রেরণা :

১.৩.১ জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব :

ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, কোন একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। পরাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামের মাধ্যমেই সাংবিধানিক উদ্দেশ্যগুলো ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপহী বিদ্রোহ, যা ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, তা ভারতবাসীর মনে এক নতুন স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খার জন্ম দেয়। জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন সম্মলনে দেশবাসীর আকাঙ্খাসমূহ পূরণ করার উদ্যোগ নেয়। ১৯২৮ সালের মতিলাল কমিটির রিপোর্টই হয়তো এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই কমিটি তার রিপোর্টে নানাধর্মী বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কমিটিই সর্বপ্রথম ভারতের রাজনৈতিক জীবন থেকে autocracy এবং compartmentalism এর মত দ্বৈত শয়তানকে মুছে ফেলার জন্য সাংবিধানিক প্রতিকারের কথা তুলে ধরে। এছাড়া এই রিপোর্ট ধর্মীয় ও ভাষাগত ক্ষেত্রে সমখ্যালঘুদের জন্য একগুচ্ছ মৌলিক অধিকারের সুপারিশ করে।

১.৩.২ গান্ধীজির প্রভাব :

ভারতবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের সুযোগ্য ও ক্ষমতাশালী প্রতিনিধি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই কারণে ভবিষ্যতে ভারতের সংবিধানে তার নিজ স্বতন্ত্র প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্দীর চিন্তাভাবনার প্রভাব লক্ষণীয়। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার সময় ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> আমি এমন এক সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করব যা ভারতকে সমস্ত ধরনের ক্রীতদাসত্ব থেক মুক্ত করবে। আমি এমন এক ভারতের জন্য কাজ করতে চাই যেখানে দারিদ্র জনগণও কার্যকরী আওয়াজ তোলার অধিকারী হবে; যেখানে কোনো উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ থাকবে না; এমন এক ভারত যেখানে সব সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে। যেখানে অস্পৃশ্যতা এবং মাদক দ্রব্যাদির কোনো জায়গা থাকবে না। যেখান থেকে আমরা বাকি

বিশ্বের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিতি পারব। আমরা শোষণ করব না এবং নিজেরাও শোষিত হব না। আমাদের একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী থাকবে। আমরা দেশে বা বিদেশে যে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলব। ব্যক্তিগত ভাবে আমি দেশ এবং বিদেশের মধ্যে বৈষম্য করাকে ঘৃণা করি। এই হল সেই ভারত আমি যার স্বপ্ন দেখি।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্পর্কিত গান্ধীজির এই ধারণাই প্রস্তাবনাসহ সংবিধানের নানা অংশে প্রতিধ্বনিত হয়।

১.৩.৩ জওহরলাল নেহরুর উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব :

গণপরিষদের প্রথম সভা বসে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর। মুসলিম লিগের অনুপস্থিতিতে গণপরিষদ তার কার্যক্রমে অগ্রসর হয়। ১৫ই ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু একটি অনুপ্রেরণাদানকারী বক্তৃতা দেন, যা পরবর্তীকালে উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব বা objectives resolution নামে বিখ্যাত হয়। এতে গণপরিষদ এর উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরা হয়। নেহরুর উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নিচে তুলে ধরা হল :

১। এই গণপরিষদ দৃঢ় ও পবিত্র সংকলন গ্রহণ করেছে ভারতকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণআ করতে এবং একটি সংবিধানের ভবিষ্যৎ পরিচালনা ব্যবস্থা রচনা করতে।

২। যেসব প্রদেশ ব্রিটিশ ভারত বা দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত বা তার বাইরে অবস্থিথ স্বাধীন ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে একটি সম্মিলিত সংঘ (union) গঠিত হবে।

৩। যে সব প্রদেশের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে বা যেসব প্রদেশের সীমানা ভবিষ্যতে গণপরিষদের নিয়মানুসারে নির্ধারিত হবে তারা সংবিধান চালু হওয়ার পর একটি স্বাধীন প্রদেশ হিসাবে প্রশাসনিক ও শাসনকার্যে যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করবে যেসব ক্ষমতা তারা ইউনিয়নকে অর্পণ করেনি।

৪। যেখানে স্বাধীন ভারতের এবং সরকারের সাংবিধানিক অংশ ও অঙ্গ সমূহের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনগণ থেকে লাভ করবে।

৫। যেখানে ভারতের সমস্ত জনগণের ন্যায়বিচার সাম্প্রতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম, পূজা-উপাসনা, পেশা, সংগঠন ও খাজনা, আইন ও সামাজিক নৈতিকতার সংঘে যুক্ত তার স্বাধীনতা, এবং

৬। সেখানে সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া উপজাতি এলাকাসমূহ এবং অবদমিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির যথেষ্ট রক্ষাকরচ থাকবে এবং

৭। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অখন্ডতা সুরক্ষিত হবে এবং ন্যায়বিচার ও জাতি সমূহের আইন মেনে স্থলে, জলে, আকাশে ভারতের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত হবে।

৮। যার দ্বারা এই প্রাচীন ভূমি পৃথিবীতে তার যথাযথ এবং সম্পদিত স্থান লাভ করতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণে তার পূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে নেহরুর উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১.৩.৪ আম্বেদকরের ভাবনা :

বহুজাতি, জাতবিশিষ্ট, বহুভাষী রাষ্ট্রে জাতি নির্মাণের (nation building) পথে গণতন্ত্রই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পথ। আম্বেদকরের

মতে, নিপীড়িতদের অধিকার রক্ষার্থে গণতন্ত্রকে সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর ভূমিকা পালন করতে হবে। এই কারণেই তিনি 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' এর 'স্বৈরাচারিতা' (tyranny of the majority) এবং 'ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ' (concentration of power) -এর বিরোধিতা করেছেন। যেহেতু, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণই হল গণতন্ত্রের সম্ভাব্য শত্রুদের মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্রে সর্বদা তার আক্ষরিক অর্থে সীমাবদধ থাকা উচিত নয়। দর্শনগত প্রেক্ষিত থেকে গণতন্ত্র 'একটি সরকারি আইনি প্রতিষ্ঠান'-এর ধারণা থেকে 'জীবনাদর্শের একটি ধারা'-য় (a way of life) রূপান্তরিত হয়েছে। আম্বেদকর বলেন ''গণতন্ত্র নিছক শাসন ব্যবস্থার একটি রূপ নয়। এটি সম্মিলিত আদান প্রদানের উপলব্ধির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের একটি গুণাবলী। এটি মূলত সহনাগরিকদের প্রতি নিষ্ঠা ও সম্মান প্রদর্শনের একটি মনোভাব''। আম্বেদকর সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ। এটিই ছিল তার কাছে প্রধান উদ্বেগের কারণ। গণতন্ত্র এই অর্থে সামাজিক স্বার্থ এবং অবিরাম আদান প্রদানকে বহাল রাখে। যে সমাজ স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এর উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজই আম্বেদকরের কাছে 'আদর্শ সমাজ' (ideal society) হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সাম্য শুধুমাত্র স্বাধীন গতিবিধি এবং জীবনের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে না, এটি জনসাধারণকে তার পছন্দমত পেশা নির্বাচনের সুযোগ প্রদান করে। প্রকৃত স্বাধীনতা জাতপাতের ন্যায় দাসত্ব প্রথার বিলোপসাধন করে। সাম্যের ধারণা শারীরিক উত্তরাধিকার এবং সামাজিক উত্তরাধিকার, জ্ঞান এবং ক্ষমতার দিক থেকে 'অসমান' (unequal) ব্যক্তিদের সঙ্গেও সমান আচরণ করে। সাম্য পুঁজির ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের মাধ্যম সমাজের দুর্বল মানুষদের বাঁচতে সাহায্য করে থাকে। গণপরিষদে সমাজে সৌভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন, ''সৌরাতৃত্ব কাকে বলে? সকল ভারতবাসীর সহমর্মিতা, আমরা এক জাতি, এক প্রাণ একেই সৌভ্রাতৃত্ব বলে। এই নীতির ফলে সমাজে একতা ও সংহতি বোধ জাগে। গণতন্ত্র বলতে এমন এক ধরনের সৌভ্রাতৃত্ববোধকে বোঝায়, যা সহনাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করে।'' একটি জাতিরাষ্ট্র অবশ্যই গণতন্ত্রকে জীবনাদর্শের একটি ধারা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা এবং নানা সনদগুলি বর্তমান দিনেও আম্বেদকরের জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নকে বহন করে।

১.৪ সংবিধানের উদ্দেশ্যসমূহ ও দর্শন :

প্রত্যেক সংবিধানেই একটি প্রস্তাবনা দেখা যায়, যা শুরু হয় মুখবন্ধ আকারে। প্রস্তাবনাটি সংবিধানের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলিকে তুলে ধরে। এই উদ্দেশ্যগুলির উপর ভিত্তি করেই সংবিধানের কাঠামোটি নির্মিত হয়। এই ভিত্তিগুলিই (foundations) সংবিধনের দর্শনকে প্রতিনিধিত্ব করে। সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলি শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যাদের উপর একটি নতুন সংবিধান গঠনের দায়ভার ন্যস্ত হয়েছিল, তাদের ধারণা (ideas) বা আদর্শের (ideals) ফসল নয়। এটি দীর্ঘসময় ধরে চলে আসা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিদেশি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা মানুষের সংগ্রামের ফসল। যারা একটি স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় (sperate national identity) প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্খা তাদের মনে সযত্নে পালন করছিল, তাদের ধারাবাহিক চিন্তার ক্রমবিবর্তনের ফসল। বিভিন্ন সময়ে নানা মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা রেখেছিল যা সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলিকে স্ফটিকে পরিণত করতে সাহায্য করে। এটিই হল সংবিধানের দর্শনের প্রকৃত সত্য।

১.৪.১ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সংবিধানের দর্শন

১৭৮৭ সালে সর্বপ্রথম প্রস্তাবনা সংযোজিত হয় মার্কিন সংবিধানে, পরবর্তীকালে একে অনুসরণ করে জাপান, আয়ারল্যান্ড, মায়ানমার ইত্যাদি দেশের মতো ভারতীয় সংবিধানের শুরুতেও একটি প্রস্তাবনা স্থান পেয়েছে। এটা মনে

করা হয়ে থাকে যে, একটি সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যেই তার মূল্যবোধ (values) ও দর্শন প্রতিফলিত হবে এবং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চান, তার উল্লেখ থাকবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে তিনি তার Principles of Social and Political Theory (১৯৫১) গ্রন্থের শুরুতে এই প্রস্তাবনাটি তুলে ধরেন। তিনি ভেবেছিলেন, এটি পড়েই তার কাজের মূল প্রতিপাদ্যটি সহজেই বোঝা যাবে। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের পরবর্তী ক্ষেত্রে মূল প্রস্তাবনায় কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়,যার ফলস্বরূপ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার পরিবর্তিত রূপটি হল :

আমরা, ভারতের জগণন, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত সত্যনিষ্ঠার সহিত শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং তাহার সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক; স্বাধীনতা, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার; সাম্য, মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার; এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করিয়া সৌভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমাদের সংবিধান সভায় আজ ১৯৪৯ সালের ছাব্বিশে নভেম্বর, এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করিতেছি।

৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি যোগ করা হয়। তাছাড়া 'জাতীয় ঐক্য' সংশোধন করে 'জাতীয় ঐক্য ও সংহতি' লেখা হয়। বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে, সংবিধান প্রণেতাদের মনের চাবিকাঠি হল এই প্রস্তাবনা। সংবিধানের বিশেষ কোনো শব্দ অস্পষ্ট বা হেয়ালি মনে হলে প্রণেতারা কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় প্রস্তাবনার সাহায্যে। সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৯৬৫) মামলায় বিচারপতি মাধলকর বলেন, প্রস্তাবনা 'বিশেষভাবে বিবেচনা প্রসূত' 'অগ্রগতিসূচক' এবং সংবিধান প্রণেতারা এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্তসার হল প্রস্তাবনা। সংবিধানের সূচনার শব্দটি 'আমরা ভারতের জনগণ' জনগণের চূড়ান্ত কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বেশিরভাগ আধুনিক সংবিধানই এই একটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধন এর মাধ্যমে শব্দগুলি ভারতের প্রস্তাবনায় যুক্ত হওয়ার পরবর্তীকালে যে প্রস্তাবনাটি স্থান পায়, তার মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্খা ও আদর্শ এর প্রতিফলন ঘটেছে এবং এগুলিকে সুভাষ কাশ্যপ তার 'Our Constitution' (১৯৯৪) নামক গ্রনেথ 'সর্বোচ্চ বা মৌলিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ' (the sureme or fundamental constitutional values) বলে উল্লেখ করেছেন। প্রস্তাবনা থেকে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়— (১) সংবিধানের কর্তৃত্বের উৎস: কর্তৃত্বের উৎস হলভারতের জনগণ; (২) ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রকৃতি : ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে; এবং (৩) সংবিধানের উদ্দেশ্য: ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্যতা এবং ভ্রাতৃত্ব।

সার্বভৌম : সার্বভৌমত্ব বলতে এমন এক চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবস্থাকে বোঝায় যা অন্যের আধিপত্য স্বীকার করে না। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর তার নির্ভরশীলতাকে অতিক্রম করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট থেকে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে অবস্থান করেছিল। কিন্তু ভারত সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইস প্রজাতন্ত্রের মতো একটি সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র পরিণত হয়। যাইহোক, ভারত এখনও পর্যন্ত কমনওয়েলথ নেশনস এর একজন পূর্ণ সদস্য। ১৯৫০ সালে লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীদের সম্মলনে সম্পাদিত চুক্তির ফলে ভারতের এই অবসথানের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ভারত সার্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও মন্তব্য করে যে, কমনওয়েলথ নেশনস এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে ব্রিটেনের রাজা বা রানীকে প্রতীকী প্রধান (symbolic head) হিসাবে মান্য করবে। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য, এর সঙ্গে আইনের কোনো

বাধ্যবাধকতা নেই। সমগ্র বিষয়টি সংবিধানের বাইরে সম্পাদিত হয়েছে। কমনওয়েলথ একটি স্বেচ্ছামূলক সংস্থা, যার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ব্রিটেনের রাজা বা রানী প্রতীকী প্রদান হিসাবে ভারতের জনগণের উপর কোনো আদেশ জারি করতে বা ভারতীয় জনগণ তা মানতে বাধ্য নয়। সুতরাং কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ ত্যাগ করার পথ ভারতের কাছে সর্বদা খোলা হয়েছে। সাধারণভাবে সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাকে বোঝায়। এই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার দুটি প্রধান দিক রয়েছে, যথা—১) অভ্যন্তরীণ এবং ২) বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হল চূড়ান্ত বা অপ্রতিহত। কোনো ব্যতি বা প্রতিষ্ঠান এর সাধ্য নেই যে, সেই আইনকে অবজ্ঞা করার। অন্যদিকে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতাকে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারকরে ভারতকে একটি সার্বভৌম রষ্ট্র বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কারণ ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য এবং এই আইনই চূড়ান্ত। সর্বোপরি, সংবিধান প্রণেতারা চিরকালের জন্য এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমাদের জনগণই দেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত সংস্থাই জানে জনগণই হল তাদের ক্ষমতার উৎস।

সমাজতন্ত্র : মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ছিল না। সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে কোনও রাজনৈতিক মতবাদের উল্লেখ করেনি। এমনকি, কোনও অর্থনৈতিক মতবাদে সংবিধান আবদ্ধ থাকুক তাও তারা চাননি। তাই পূর্বে তারা এই শব্দটি ব্যবহার করেননি। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী বিলে 'সমাজতন্ত্রে'র সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সমাজতন্ত্র' শব্দের অর্থ হল, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সর্বপ্রকার শোষণ থেকেমুক্ত সমাজ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও রকম সংজ্ঞা ছাড়াই ৪৪তম সংশোধনী হিসাবে গৃহীত হয়। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমরা সবসময় এটাই বলে থাকি যে, আমাদের গৃহীত সমাজতন্ত্রের নিজস্ব ধরণ (own brand) রয়েছে, আমরা সেই ক্ষেত্রগুলিরই জাতীয়করণ করব যেগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব, শুধুমাত্র জাতীয়করণ করাই আমাদের সমাজতন্ত্রের ধরণ নয়'। মনে করা হয়, ভারতের সংবিধানে মূলত 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র (welfare state) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সমাজতন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন রকম, যে কারণে এর একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সাধ্যের বাইরে। সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং ব্যক্তি মালিকানার বিলোপসাধন সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। সমাজতন্ত্র সমকাজের ক্ষেত্রে সমমজুরির কথা বলে। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ব্যক্তির মর্যাদার ক্ষেত্রে সব ধররে বৈষম্য এর দূরীকরণ এর উদ্দেশ্য। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির সংযুক্তিকরণ এর ফলে সংবিধানের ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে আদালতগুলি অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয়করণের পক্ষে কথা বলছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করবে না। বিচারপতি দেশাই এর মতে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ একজন ব্যক্তির ধর্মঈয় আনুগত্যের কথা বিবেচনা না করে নাগরিক হিসেবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করে, কোনও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে না বা কোনও ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না বা ধর্মের প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করে না। জে বি বুখারি বনাম বি আর মেহরা ব্রাদার্স মামলায় (১৯৭৫) বিচারপতি এম এচি বেগ বলেন, ধর্মীয় মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে, ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মঙ্গল করাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এছাড়াও কেশবানন্দ ভারতী মালমাসহ একাধিক মামলার রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংবিধানের অন্যতম মৌল কাঠামো বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতে মূলত, 'সর্বধর্ম সমভাব' অর্থাৎ সব ধর্মের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এর অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য 'wall of weparation' বা 'পৃথকীকরণের প্রাচীর' মডেলকে অনুসরণ করেনি। রাজীব ভার্গব তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার 'নীতিগত দূরত্ব' (Principled Distance) গএর মডেল দ্বারা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন একটি ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণের কঠোর প্রাচীর তৈরি করেনি, বরং ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে 'নীতিগত দূরত্বের' পন্থা গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এটি কখনও ব্যক্তিজীবনে ধর্ম বর্জনের কথা বলেনি, আবার অন্যদিকে সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সমস্ত ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান আচরণ নয়, বরং সমস্ত ধর্মকে সমান হিসেবে দেখা। এই নীতি যেমন কখনো কখনো কোন বিশেষ ধর্মে হস্তক্ষেপের পথ খোলা রেখেছে, আবার অন্যদিকেবিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারও দিয়েছে।

গণতন্ত্র : গ্রিক শব্দ 'Demos' (জনগণ) এবং 'karatos' (শাসন) থেকে গণতন্ত্রে ইংরেজি প্রতিশব্দ 'democracy' এসেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক অর্থে এটি শাসন ব্যবস্থার একটা ধরণকে বোঝায়, যেখানে নির্বাচিত প্রশাসকেরা তাদের সম্পাদিত কাজকর্মের জন্য নির্বাচক তথা জনগণের নিকট দায়বদধ থাকেন। কিন্তু ব্যাপক অর্থে তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার কথা বলে।ছ সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি আম্বেদকর মনে করতেন অর্থনৈতিক এবং সামাজিকক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ। ভারতীয় প্রস্তাবনায় এই অর্থেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতে মূলত প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে এবং 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা দেশের সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে শিক্ষা, সম্পত্তি, আয়কর, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাধিকার অর্পণ করে ব্যাপকতম প্রতিনিধিত্বের চেষ্টা করেছেন। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলেনারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটদানের অধিকারী হয়। তাছাড়া স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকারও ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম একটি দিক।

সাধারণতন্ত্র : সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যেখানে মানুষই প্রধান। সেখানে কোনও সুবিধাভোগী শ্রেণী নেই, সমস্ত সরকারি কার্যালয় সব নাগরিকদের জন্যই উন্মুক্ত এবং সরকার সেখানে কোনোরূপ বৈষম্য করবে না। এখানে কোনও বংশানুক্রমিক শাসক থাকবে না এবং রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মেয়েদের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণতন্ত্রর বৈশিষ্ট্যগুলির বিত্তিতে বিচার করে ভারতকে একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশ বলে অভিহিত করা যায়। কারণ বারতের প্রধান হল রাষ্ট্রপতি। তিনি যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানীর মতো উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন না। তাকে পাঁচ বছরের ন্য ভারতের জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতে হয়। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংবিধান বিরোধী কোনো কাজ করলে তাকে ইনপিচমেন্ট বা অভিযোগ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকালের মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বেই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট তাকে পদচ্যুত করতে পারে। সাধারণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিচারপত কুলেবলেন, 'জনগণের পছন্দ করা প্রতিনিধিদের সরকার'। বিচারপতি হিদায়েতল্লা এর মতে, 'সাধারণতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা অন্তিম বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল, রাজা বা ঐ জাতীয় কোনও একজন ব্যক্তির উপর নয়'। আমাদের সংবিধানে ব্যাপক অর্থে 'সাধারণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়।

অধ্যাপক দুর্গাদাস বসু তার 'Introduction to the Constitution of India' (১৯৬০) নামক গ্রন্থে বলেন, ভারতের প্রস্তাবনা দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সাধন করে, একদিকে তা সংবিধানের কর্তৃত্বের উৎস নির্দেশ করে এবং অন্যদিকে সংবিধানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেও তুলে ধরে। সুতরাং প্রস্তাবনায় উল্লেখিত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র

শব্দগুলি আলোচনার পরবর্তীকালে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হিসাবে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ধারণাগুলি সম্পর্কেও বিশদে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ন্যায়বিচার : সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকদের প্রতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে. সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতা ও তার প্রচার নিষিদ্ধ করে সামাজিকভাবে সৃষ্ট বৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এর তুলনায় ন্যায়বিচার এর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে. জাতি, ধর্মী, স্ত্রী-পুরুষ, উপাধির জন্য নাগরিকরা যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন তা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক যাতে সমান ব্যবহার পায়, সামাজিক ন্যায়বিচার এই ধারণাকে সুনিশ্চিত করে। সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকাশ্য স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্র ব্যক্তির কোনোরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। ন্যায়বিচার সম্পর্কে নেহেরু বলেছেন, 'অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের ওপর সামাজিক ন্যায়বিচারের যথেষ্ঠ প্রভাব আছে। আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে নয়, সামাজিক ন্যায়ের আবেগের জন্যই লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়'। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রকৃত অর্থ গরিব ও ধনীদের সমান দৃষ্টির সহিত দেখা এবং তাদের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনা। সেই কারণেই ১৫(৪)নং ধারা অনুসারে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ১৫(৫)নং ধারা অনুসারে অনগ্রসর শ্রেণিগুলোর শিক্ষায় এবং ১৬(৪)নং ধারা অনুসারে চাকুরিতে যথাযথ অংশগ্রহণের সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে. ২০১৯ সালে ১০৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে উপরিউক্ত জাতি এবং শ্রেণিগুলো ব্যতিরেকে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশ (Economically weaker section বা EWS)-এর জন্যও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৮নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর উন্নতিরজন্য সংগ্রাম করবে। প্রত্যেক নাগরিকই যাতেতার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে পারেএবং তা সমষ্টির ব্যবহারের লাগে, এমন উপাদানগুলির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যাতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে যাতে সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন না হয়, উৎপাদনের মাধ্যমগুলি যাতে জনস্বার্থ বিরোধী না প্রতিপন্ন হয়, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য যাতে সমকাজে সমমজুরি পাওয়া যায়, শিশু ও নারীকে অন্যায় পথে ব্যবহার করা রদ হয়, অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য বাধ্য হয়ে বয়স ও সামর্থ্যের অনুপযোগী কোনও কর্ম সম্পাদন করতে নাগরিকরা বাধ্য না হন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যাতে শিশুরা বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়, শোষণের বিরুদ্ধে শৈশব ও যৌবনকে যাতে রক্ষা করা যায় সেজন্য সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক ন্যায় এর ভাবনাতেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত সংবিধানের চতুর্থ অংশে ন্যায়বিচারযুক্ত একটি নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য নিয়েই কর্ম-শিক্ষা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা লাভ করার অধিকার, মানুষের কর্মপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা, শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, দুর্বল শ্রেণী সমূহের জন্য শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে সংবিধানের ওই সমস্ত অনুচ্ছেদে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করার অধিকার রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের ধারণার অন্তর্ভুক্ত। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকারকে মান্যতা দিয়েছে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদ এবং ৩২৫ ও ৩২৬ অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। নেহেরু ও আম্বেদকরের মতো সংবিধানের জনকরা একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক ন্যায় ছাড়া রাজনৈতিক ন্যায়বিচার অসম্পূর্ণ। অপরদিকে আমাদের সমাজে যেখানে জাতপাত এর মত বৈষম্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের পক্ষে কর্মপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি, প্রসবকালীন সাহায্য, ছুটি, অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ও নূন্যতম মজুরির ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদান নিষিদ্ধ করা (২৩ ও ৪৩ অনুচ্ছেদে) ইত্যাদি সামাজিক ন্যায় কায়েম করারই

প্রচেষ্টা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে আম্বেদকর বলেছেন, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি আমরা এমন এক পরস্পরবিরোধী জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি যেখানে রাজনীতিতে 'সাম্য' থাকবে আর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বজায় থাকবে অসাম্য। রাজনীতিতে একজন ব্যক্তির একটি ভোট এবং প্রতিটি ভোটের মূল্য এক, এই নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি। আর আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামার জন্য, আমরা এই গৃহীত নীতিকে অস্বীকার করেই যাবো।

স্বাধীনতা : প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। লাতিন শব্দ 'লিবার' থেকে 'লিবার্টি' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বন্ধীদশা, দাসত্ব, ক্রীতদাস প্রথা বা স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি বা 'স্বাধীনতা'। আমাদের সংবিধানে 'স্বাধীনতা' শব্দটি কেবলমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তা ইতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্বাধীনতার ধারণা শুধুমাত্র ব্যক্তির গতিবিধির উপর আরোপিত বিধিনিষেধের বিলোপসাধনের কথা বলে না, এই ধারণআ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টির কথাও বলে। সমাজ ব্যক্তিদরে নিয়ে গঠিত সুতরাং ব্যক্তির বিকাশের উপরেই সমাজের অগ্রগতি নির্ভরশীল। অতএব, সমাজের স্বার্থে সামাজিক দশা ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ব্যক্তির চিন্তা ও কার্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্বাধীনতার সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। তাই আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্যের অনুপস্থিতি বলে উল্লেখ করা হয়নি বরং ইতিবাচক অর্থে, স্বাধীনতাকে 'চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার অধিকার' বলা হয়েছে। এটি বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতাকে একত্রিত করেছে, যা আমাদের সংবিধানের অন্যতম অংশ ''মৌলিক অধিকার'' এ স্থান পেয়েছে এবং ব্যক্তি ও জাতির বিকাশে একে অতি প্রয়োজনীয় বলেবিবেচনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত 'স্বাধীনতার অধিকার' (১৯-২২নং ধারা) এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮নং ধারা) প্রধান করে প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, এর সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, এই অধিকারগুলি যা মৌলিক অধিকার নামে পরিচিত, এবং তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্ত বা ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয়।

সাম্য : সাম্য এবং স্বাধীনতার ধারণা একে ওপরে পরিপূরক। ফরাসি বিপ্লবের নেতারা মনে করতেন, আইনের চোখে প্রত্যেক মানুষই সমান। আইন যদি কাউকে শাস্তি দেয় বা রক্ষা করে তবে তা অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে এবং বৈষম্যহীন ভাবে করতে হবে। নিজ নিজ যোগ্যতা, গুণ ও মেধা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক সরকারি পদ, সম্মান ইত্যাদি লাভ করার ক্ষেত্রে সমানভাবে যোগ্য। তবে, এই সাম্যের ধারণা কখনোই একথা ঘোষণা করে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সমান। এই ধারণা মূলত ব্যক্তির মর্যাদা ও সুযোগের সমতার অধিকারের কথা বোঝায়। প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে যে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তাকে সংবিধানের ১৪-১৮নং ধারার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে সব মানুষ সমান এবং দেশের আইন সকলকে একই রকম সুরক্ষা দিতে বাধ্য। তাছাড়া কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী অন্য কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীকে শোষণ করবে না। জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ এরভিত্তিতে প্রকাশ্য স্থানে প্রবেশে বাধা এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না। ভোটদানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমানভাবে যোগ্য। অতএব, বলা যায় সাম্যের ধারণার রাজনৈতিক, আইনগত, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিব্যাপ্তি রয়েছে।

সৌভ্রাতৃত্ববোধ : প্রকৃপক্ষে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এর ধারণা তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান, এই বোধ যেন মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য

প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের কথা বলা হয়েছে, তা সবই ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রসারের জন্য। সংবিধানের IVA অংশে যেখানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, এই ধারণার কথা সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সৌভ্রাতৃত্বের একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আছে যা আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ 'বসুধৌব কুটুম্বকম' (পুরো পৃথিবীটা আমাদের পরিবার) এখানে উল্লেখযোগ্য। নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ৫১নং ধারায় এ বিষয়ে বিশদে বলা হয়েছে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের সুমহান আদর্শের রূপায়ণে ঘটেছে সংবিধানের ৫১নং ধারার মধ্যে। এই ধারায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির উন্নতি বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, যা বিশ্বভ্রাতৃত্ব এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ব্যক্তির মর্যাদাবোধ : ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে যদি ব্যক্তির মর্যাদাবোধের রক্ষার চেষ্টা না করা হয়। ব্যক্তির মর্যাদা সংবিধান প্রণেতাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটি মানবাধিকারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীনতা, সাম্যের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তির জীবনের মান উন্নয়ন করার চেষ্টাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাছাড়া, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা দূর করা রাষ্ট্রের কর্তব্য (৩৮নং ধারা)। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করা (৩৯নং ধারা) ন্যায় সঙ্গত মজুরি ও মানবিক কাজের পরিবেশের সৃষ্টি (৪২নং ধারা) ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিন্ত (৪৬নং ধারা) করার জন্য সংবিধান প্রণয়নকারীরা নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়ে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি : ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করার জন্য জাতি গড়া এবং তার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা রাষ্ট্রে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ভারতের মতো একটি বৈচিত্রময়ী এবং বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে গঠিত সমাজে সৌহার্য্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা যায় বলে মনে করা হয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছাড়া একটি দেশ কখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াসে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না এবং দেশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে ভিতকেও সুস্থায়ী করতে ব্যর্থ হবে। সেজন্য ৫১এ অনুচ্ছেদে সঙ্গতভাবে প্রত্যেক নাগরিককে ভারতের ঐক্য ও সংহতি এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মনে করা হয়, প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের মধ্যে সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে এবং সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবে।

১.৫ উপসংহার: সংবিধানের দর্শন এবং প্রধান স্থানান্তর :

প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুন্দর সুন্দর শব্দগুলি আমাদের সংবিধানের দর্শন, আত্মা ও আদর্শের প্রতিনিধিস্বরূপ। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির দ্বারা এই প্রস্তাবনাটি বহুবার প্রশংসিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের আলোচনার পরিশেষে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হল প্রস্তাবনাটি কি সংবিধানের অংশ? এই প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত অংশ। ভারতের বিচারবিভাগ বিভিন্ন মামলার রায় ঘোষণাকালে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেছে। ১৯৫০ সালে এ কে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টে মন্তব্য করে যে, প্রস্তাবনাটি আইনের ধারা বলবৎযোগ্য না হলেও সংবিধানের অস্পষ্টাত দূরীকরণে এটি সাহায্য করে। আবার, ১৯৬০ সালের বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকর প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ বলে মনে করেন নি। কিন্তু কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩) প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বেরুবাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত ভ্রান্ত ছিল। কারণ, সংবিধানের অন্যান্য অংশের মতো প্রস্তাবনাও তার অংশ। তাদের মতে, সংবিধানের ৩৬৮নং ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রস্তাবনার সংশোধন করা গেলেও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে কোনোভাবেই সংশোধন করা যায় না।

পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যসমূহকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করেছে এবং সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিগুলোকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দ তিনটি সংযোজিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানে না থাকার ফলে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির আবির্ভাবের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এক্সেল ওয়্যার বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় (১৯৭৯) সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' কথাটির সংযোজন আদালতসমূহকে শিল্পের জাতীয়করণ এব রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আবার, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হলেও এই প্রস্তাবনায় 'বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা' এবং ২৫-২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার জনগণকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব, বলা যায়, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে তিনটি মৌলিক নীতি ও আদর্শ সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়, সেগুলি পূর্বেই সংবিধানের নানা অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ওই একই সংশোধনীতে সংবিধানে নাগরিকদের 'মৌলিক কর্তব্য' সংক্রান্ত একটি নতুন অংশ। IVA এবং ৫১A ধারা সংযোজিত হয়। এই অংশে ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা দেশের ঐতিহ্য ও মিশ্র সংস্কৃতি, সার্বভৌমিকতা, একতা, অখন্ডতা, পরিবেশ, প্রভতি সুরক্ষিত থাকবে। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে 'সর্বাধিক বিতর্কমূলক' সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ভারতকে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। ১৯৬২ সালে ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে যথাক্রমে পঞ্চায়েত এবং পৌর এলাকায় জনগণের স্বশাসনের দর্শনকে বাস্তবায়িত করেছে এবং গণতান্ত্রিক বাস্তবতাকে সমাজের একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ২০০২ সালে ৮৬তম সংশোধনের মাধ্যমে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের সমস্ত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯ সালে ১০৩তম সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশ (Economically Weaker Section বা EWS)-এর জন্যও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কি ধরনের রাষ্ট্র বলা হয়েছে?

২। প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলো কিভাবে বর্ণিত হয়েছে লেখ।

৩। ভারতের সংবিধানিক দর্শনে গান্ধীজির কিরূপ প্রভাব ছিল?

৪। আম্বেদকরের চিন্তা কিভাবে ভারতীয় সংবিধানের দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে তা লেখ।

৫। ভারতের সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিতে নেহরুর প্রভাব আলোচনা কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানের দর্শন সম্পর্কে বিশদে আলোচনা কর।

৭। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কর।

৮। ভারতীয় সংবিধানের কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছে?

৯। ভারতীয় সংবিধান কিভাবে নাগরিকদের প্রতি ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করেছে?

১০। পরবর্তীকালে সংশোধনের মাধ্যমে কিভাবে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিগুলোকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে?

১.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

i. Basu, Durga Das. (2021). *Introduction to the Constitution of India* (25th ed.). LexisNexis.

ii. Bhargava, Rajeev. (Ed.). (2009). *Politics and Ethics of the Indian Constitution.* Oxford University Press India.

iii. Kashyap, Subhash C. (2018). *Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law* (5th ed.). National Book Trust, India.

iv. Kashyap, Subhash C. (2016). *Our Political System* (1st ed.). National Book Trust, India.

v. Khosla, Madhav. (2012). *The Indian Constitution - Oxford India Short Introductions.* Oxford University Press India.

vi. Bakshi, P.M. (2020). *The Constitution of India* (17th ed.). LexisNexis.

C.C : 2.2

Unit-2

Federalism and State Autonomy

Contents :

2.1 Objectives

2.2 Meaning and Definition of State Autonomy

2.3 Difference between autonomy and succession

2.4 Indian Framework: the Historical journey of Centre-State Relations

2.5 Areas of discontent by the state government

2.6 Recommendation of various Commissions on Centre-State relations

2.6.1 Hanumanthayya Committee Report

2.6.2 Rajamannar Committee Report

2.6.3 Justice R.S Sarkaria Commission (1983)

2.6.4 Recommendations of National Commission on Review of Constitution

2.6.5 Justice M.M Punchi Commission

2.7 Conclusion

2.8 Self Assessment Question

2.9 Suggested Readings

2.1 Objectives

This unit in its first part intends to provide the students with an insight into the concept of state autonomy and focuses on the difference between autonomy and succession. The objectives of the subsequent sections of the unit are to trace the historical trajectory of centre-state relations in India, to explore the areas of discontent by the state governments and to especially lay emphasis on the recommendations of various commissions on Centre-State relations in India.

2.2 Meaning and Definition of State Autonomy

The Treaty of Westphalia in 1848 evolved the concept of "**nation-state**" in a true sense. State is the most important institution of the society. The nature of the state autonomy is shadowy. It is important for any country to establish its unity and security on one hand and to maintain its state's demand on the other hand. The issue of autonomy has occupied the central concern of social and political existence. Autonomy is a freedom and

also self-determination. Etymologically, the word "autonomy" is being derived from two Greek words "self" and "rule" or "law". Hence the meaning stands as "self rule" or "independence". The concept of state autonomy should be understood with reference to demands of the units of a federation for autonomy within the parameters of a federal constitution and opposition to centripetal forces.

It has both positive and negative implications. On positive note, it denotes for the right of the state to work independently within the framework of prescribed law of the land. On the other hand, it is the non-interference of the centre in the prescribed domain of state autonomy. According to Francine Franker "autonomy is strength for crucial role of politics in the Indian mode of development where nation building, economic development and an egalitarian social order were all supposedly contingent upon the democratic process. Autonomy is further buttressed by the general point of that irrespective of an economic of socialism or capitalism, the demand of the national security, modern technology and a bureaucracy".

2.3 Difference between autonomy and succession

Secession (a term which is derived from Latin word secession) is the withdrawal of a group from a larger entity, especially a political entity, but also from any organisation, union or military alliance. Threats of succession can be strategy for achieving more limited goals. It could involve a violent or peaceful process but these don't change the nature of the outcome, which is the creation of a new state or entity independent from the group or territory it seceded from.

On the other hand, state autonomy means 1) the quality or state of being self governing especially the right of self government. The territory was granted autonomy. 2) Self directing freedom and especially moral independence personal autonomy. 3) A self governing state.

2.4 Indian Framework: the Historical journey of Centre-State Relations

In order to understand the relations between Centre and State government which triggered the issue of state autonomy in India, one need to follow and consider the below mentioned stages

a) **Nature of Federation**: soon after independence from her colonial master i.e. the British, India followed a set of two governments namely the Central government and the State government. The framers of the Constitution have bestowed a strong Centre chiefly due to two reasons: 1) Due to nearly two hundred years of imperialism, Indian economy was totally shattered, devastated and with disruptured infrastructure. 2) India as a country is surrounded with multi-linguistic, multi-culture societies, religions etc. There is seldom any country with such vast heterogeneous nature. Hence a powerful and strong Centre was the call of the hour to encapsulate several state governments. The word **federalism** has no where being used in Indian constitution. Article 1 state that "India i.e. Bharat is the Union of State". K.C Wheare describes India as "quasi-federal", a unitary state with subsidiary unitary features.

Sir Ivor Jennings described India as a "federation with a strong centralizing tendency". Norman D Palmer argued that "the republic of India is a federation, although it has many distinctive features which seem to

modify the essentially federal nature of the state".

In the 50's and early 60's, the foundation of federation was laid by Jawaharlal Nehru. It was a period of Congress dominance both over Centre and State. Beside that Congress party had the power to assimilate different sections of the society their different views and opinions. Hence these two factors helped the party to sail smoothly whereby the state governments believed that remaining under Centre government would help them to attain their desired level of development and also greater grant in aid from the Centre. Except on the issue of formation of new state, the relation between the Centre and State remained quite normal during this period.

In the middle of the 1960s, specially after the death of Jawaharlal Nehru, Congress dominance started declining. It was found that a large number of state opposition parties become to occupy power. The chief reasons behind this occurrence were due to 1) some state were complaining about negligence by the Central government. 2) India is a vast landmass with heterogeneous interest, culture and demands. Owing to this, every state is not of equal capacity and potential. Hence differential treatment is necessary to uplift poorer state and cater to their need.3) the unequally distribution of power between Centre and state government already started to yield results by that time and different state governments can feel the heat out of it.

Allegations started coming in regarding unnecessary interference by the Central government headed by Congress at the expense of state government. Congress party to this was not very comfortable with the idea of dealing with the government lead by opposition parties. Henceforth the concept of state autonomy begun to Make her first discussion. Situation was further deepened by 1989 onwards when Congress dominance has largely ended and we have entered an era of coalition politics both at the state as well as Central level. Hence the scenario was such- government ruled by Central and State governments were different political parties. Under such situation, the issue of state autonomy was bound to find her voice in larger aspect. Thus it is in the second phase that the issue of autonomy became very potent politically.

2.5 Areas of discontent by the state government

It is to remember that many State government and even many political parties have from time to time demanded that state should have more autonomy. However "autonomy" refers to different things for different states and political parties. Sometimes there is a demand that distribution of powers should be changed in favour of state government whereby bestowing more and increased power to the respective state governments. Many states like Tamil Nadu and West Bengal with many political parties like DMK, Akali Dal and CPI-M have made demand for autonomy .Time and again, these are the listed reasons behind fall out of the relations between central and state government.

a) The state government arbitrary denounced the deployment of paramilitary troops without prior consultation with the government inspite of the fact that law and order is very much a state subject. To this, the Union government maintained that it had the unfettered right of stationing not only CRF and BSF units but also the units of the armed forces in aid of civil power.

b) The state government also complained about monopolising the control of industries, trade, commerce and production and distribution of goods. Despite of being into state list, the centre on the other hand have always tried to control by taking advantage of the constitutional provision that Parliament could regulate them in national interest.

c) The state resented against the central government that it had monopolised the control of industries, trade, commerce and production and distribution of goods. They argued that even though these all were into state list, the centre always tried her level best to bring under its own control by taking advantage of constitutional powers which Parliament have given it to regulate for the sake of national interest. The framers of the constitution did not place Planning Commission as a statutory body. Unfortunately this institution has turned out to be a "super government" whereby the central government started using it as a weapon against state government to remain subservient. Hence a demand which cropped up was that to grant independent autonomous body to Planning Commission rather than acting merely only as an agent of central government. Presently the Planning Commission has been abolished by Modi government and Niti Aajog formed at 1st January 2015. Its parent agency is again central government with different state Chief Ministers and other dignitaries to fit in the role of old Planning Commission.

d) The issue of promulgation of President's rule in the state and the role played by the governors with this regard is quite a matter of contention for the state governments. Allegation often stemmed as Centre used this article 356 to serve her own vested interest. The governor is not an elected office-holder. Many governors have been retired military officer or civil servant or politicians. Besides the governor is appointed by the centre government and the actions of the governor is often viewed as interference by the central government in the functioning of the state government. When two different parties are in power, at the centre and the state, the role of the governor becomes even more controversial. The Sarkaria Commisson examined the issues relating to the centre-state , recommended that appointment of the governors should be strictly non-partisan.

e) Another demand is that central government should give more independent source of revenues and greater control of resources to the state governments. To run any state, huge amount of capital is needed and distribution of revenues as elucidated in the constitution. There is an acute competition among state and among individual, groups and regions within a state. The tension between state over the location of steel plants and other heavy industries and changes of partisanship levied against the centre government. State is financially poor and looks always to the centre for relief. State's deficit budget, their loans from market and overdrafts and their debts to central government have compounded .hence they are demanding for financial **autonomy**. Unfortunately for a state it is not so easy to implement their socio-economic program with their limited resources of income. In 1977, the Left Front government in West Bengal brought a document demanding a restructuring of centre-state relations in India. This implicit idea for greater financial autonomy was furthered supported by

the governments like Tamil Nadu and Punjab.

f) The issue of cultural and linguistic specially in the southern part of the country have cropped up since 1960s. The opposition to the domination of Hindi as the language in Tamil Nadu or demand for Punjabi culture are long instances of this. Some state also feels that there is a domination of the Hindi speaking areas over the others. Infact during the decade of 1960s , there were agitations in some states against the imposition of the Hindi language. Similar incidents and same issue has reverted to recent times when there is a fear by the state governments that the Central government is trying to impose the language Hindi.

g) Article 370 was another factor which strained the matter of equality among the federal units of India. The first noticeable inequality is with regard to special status to Jammu and Kashmir by making reference to its instrument of accession. This article was in complete violation with other status of the state. Questions rose as why a separate status would be honoured to a particular state which is much against the conscience of the constitution. On 5th August 2019, President Ram Nath Kovind issued a constitutional order superseding earlier order of 1954 that all the clause of article 370, except clause 1 to be inoperative.

2.6 Recommendation of various Commissions on Centre-State relations

To examine the entire question regarding the relationship that should exist between the two set of government in a federal structure and to suggest amendments to the constitution so that to secure state autonomy in an amicable way. Here are the list of the following Commissions which is different times suggested several recommendations

2.6.1 Hanumanthayya Committee Report

Under the chairmanship of Sri K. Hanumanthayya , the government of India set up an Administrative Reform Commission. It submitted its report in 1969. Its recommendation is as follows

a) The Commission considered the unity of India as of paramount importance. Therefore, the centre must have powers to protect and maintain the safeguard the unity of India. At the administrative level, over concentration of the authority should be avoided.

b) With regard to allocations of function and resources between the centre and state, the commission recommended for a loan for a plan scheme when they can use it for productive type. The issue of repayment and timely payment should be maintained by the state and for this Finance Commission should look into the matter.

c) Appointment of governor should be made in consultation with the Chief Minister. Proper guidelines should be made regarding using discretionary power of the governor which will be sanctioned by Inter State Council and central government.

d) Inter State Council to be constituted under article 263 to settle all the disputes by engaging into mutual discussions between central and the state government.

e) Use of armed forces by the centre to the state should be made with consultation to the state or suo moto for the interest by the centre.

f) Powers should be exercised by the state with reference to the projects undertaken by the centre as an agent to facilitate

2.6.2 Rajamannar Committee Report

The DMK government in Tamil Nadu, in the wake of fourth general election constituted a committee under the chairmanship of Dr P.V

Rajamannar to discuss the serious subject of centre-state relationship.

The committee submitted its report on 1971. It made the following observations which have preserved the trend of unitary features:

a) Special power of the centre as conferred by the constitution.

b) One party rule both at the centre and at the state.

c) Inadequacy of the state's fiscal resources and consequent dependence on the centre and

d) Central planning and the role of the Planning Commission.

Few Important recommendations are as follows:

1) The governor should be appointed by the President of India with consultation of the state cabinet or with the state authorities respectively.

2) The President before proclaiming article 365 should refer the report to the governor of that respective state legislative.

3) Replacement of article 365 should be made as t only acts as a tool for the central government.

4) Sufficient safeguard should be made by the constitution of India to protect the state from the atrocities and encroachment from the central government.

5) State should have equal representation in Rajya Sabha.

The committee's report was rejected by the political parties like Akali Dal and National Conference. It have been alleged that the Recommendations were solely done to empower the state government keeping aside the importance of central government at bay. The recommendations were rejected by the Central government.

2.6.3 Justice R.S Sarkaria Commission (1983)

When Indira Gandhi was the Prime Minister of India, she constituted Sarkaria Commission. The Commission was asked to review "the working of existing arrangement between the centre and the states in regard to powers, functions and responsibilities in all spheres. In doing so, the Commission would "keep in view the social and economic developments that have take place over the years and have due regard to the scheme and the framework of the constitution the founding fathers have so sedulously designed to protect independence and to secure the unity and integrity of the country which is of paramount importance for

promoting the welfare of the people". It made extensive recommendations on several fields:

Legislative Field:

1. Residuary powers of legislation dealing taxation should be bestowed to Parliament whereas other than taxation should be given under concurrent list.
2. State governments individually and collectively should be consulted with regard to issues regarding national importance but this need not to be constitutional obligation.
3. When a resolution passed by the State Legislative Assembly for abolition or creation of a Legislative Council in the state is received, the President shall cause the resolution to be placed within a reasonable time before Parliament.

Administrative field:

Articles 256,257 and 365 have been created to facilitate co-ordination between two set of government for effective use of union and national policies. Utmost care should be taken before the decision of implementation of article 356. Use of article 258 was traced to provide smooth and progressive decentralization of powers to the state governments.

Role of the Governor:

Parameters like the mentioned below points should be kept in mind while appointing a governor:

1) An eminent person in some walks of life,
2) A person not belonging to the same state
3) A detached figure and not too intimately concerned with the local politics of the state and
4) A person who has not largely taken part in politics.

People representing from minority group should be given preference. Special care should be taken as not to appoint somebody from the ruling party or from any state party. Chief Minister should be consulted before the selection of governor (Article 155) should be amended accordingly. In this connection Prime Minister has to consult the Vice President of India and the speaker of Lok Sabha informally. Five year tenure of governor should be retraining except in some exceptional case.

After laying down as governor, they should refrain to return to active politics. He cannot dismiss Council of Minister as long as they enjoy a majority in Legislative Assembly.

Emergency Powers:

Every detail has been spelled out before the implementation of article 365 which are as follows:

a) It should be used sparingly, as a last resort.
b) Every attempt at state level should have been met.
c) Governor should explore all means before Legislative Assembly.
d) Governor's report on the basis should have wide media coverage.

Interchange of Officers:

There should be a system of inter change of the officers of the state armed police with those of the Central

Reserve Police Force, the Border Security Force and Union Armed Forces. They should have a common regional training centre so that to enable a better way of harmony between centre and state.

All India Services:

The spirit behind the creation and maintenance of all India service should be maintained in order to uphold the integrity of the country. Every all India service may dissuade the state government from using the powers of transfer, promotion, posting and suspension of all India service officers in order to discipline them. There should be regular consultations on the management of all India service between centre and state governments.

Inter- Governmental Council (Article 263)

Importance should be traced regarding setting up of Inter-Governmental council to be made despite of the presence of National Development Council. The five present Zonal Councils to be constituted under article 263.

Financial Relations

The Union government should give its consent freely to the state for borrowing loans from banks and financial institutions for a period less than a year.

Mass Media

Media has to play a crucial role i facilitating harmony between national and regional aspirations. It has to maintain a balanced notion to bring harmony amongst different sections of the society.

2.6.4 Recommendations of National Commission on Review of Constitution

Under the chairmanship of Justice M.N Venkatchalliah, the former Chief Justice of India, the National Commission was set up in the year 2000 under NDA government. The following are the recommendations:

1) Individual and collective consultations with the states shall be undertaken by the union through the Inter State Council.
2) A new item "Management of Disasters and Emergencies, Natural or Man-Made shall be included in the List 3 of the Seventh Schedule of the Indian constitution.
3) River water disputes shall be heard and disposed of by a Bench consisting of not less than 3 judges of the Supreme Court.
4) There shall be a time, say a period of six months, within which the Governor shall take a decision whether to grant assent or to reserve a bill for the consideration of the President of India.
5) Article 356 shall be used sparingly and only as a remedy of the last resort and after exhausting action under article like 256 and 257 and 355.
6) The question whether the Ministry in the state has lost the confidence of the Legislative Assembly or not shall be decided only on the floors of the Legislative Assembly and nowhere else.
7) President's rule in the state shall be proclaimed on the basis of Governor's report under article 356 (1) and
8) Article 356 shall be amended to ensure that the State Legislative Assembly shall not be dissolved

either by the Governor or the President of India when such a resolution is under the consideration of the Parliament.

2.6.5 Justice M.M Punchi Commission

The Commission was set up in the year 2007 during UPA Government. After Sarkaria Commission, the Punchi Commission again made some extensive recommendations out of which are as follows:

1) The role, responsibility and jurisdiction of the centre relating to states during major and prolonged outbreaks of communal violence, caste violence or any other social conflict leading to prolonged and escalated violence.
2) The role, responsibility and jurisdiction of the centre state in promoting effective devolution of powers and autonomy to Panchayati Raj institutions and local bodies including the autonomous bodies within a specific period of item.
3) The need and relevance of separate taxes on the production and on the sales of the goods and services subsequent to the introduction of Value Added Tax (VAT) regime.

2.7 Conclusions

Keeping in views of so many Commissions and endeavour by the central government one cannot deny the fact that the issue of state autonomy have gained importance over the past few decades. With the influx of coalition government right after 1999 (full term completion coalition government) , whereby government at the central and state government are different and varied, a strong wave for the autonomy has risen. On the other side of the picture if we are to understand the issue of granting state autonomy then the following grounds have to be taken into considerations:

1) Autonomy is not independence of the state and the autonomy is demand under the Indian federal structure and therefore there is no danger of disintegration.
2) The functions of the state as such are rising day by day. It is not proper to make them financially depended upon the centre while they are performing the function of rural development and implementation of five years plans. If they are assigned separate resources of finance then it will be convenient for them to perform developmental functions speedily.
3) State autonomy is essential for the establishment of true and genuine federal polity. At present, the status of the state as such is like municipalities and they are always afraid of central intervention. The centre controls state by issuing directives and even exercises control over the exclusively state spheres like education and health.
4) The autonomy will inculcate a sense of responsibility amongst the states. They will seek additional revenue resources and will not depend on the centre.

Now the questions remain as:

1) Will the centre grant state autonomy?

2) If yes, to what extended?
3) What about the question of "Union of States"? We are quasi federal. Will that not mean disturbing the basic structure of the constitution?
4) What about the territorial integrity and pulling all heterogeneous state all together? Will it be not a compromise if states are granted autonomy?

Perhaps before making any major and crucial decision, the central government has to think repeatedly about the consequences. It has to think about the logic put forwarded by the framers of the constitution who strongly advocated for a strong centre. It also has the onus to look after the recommendations which the various Commissions years after years had made. Political scenario and culture does not remain same under any given condition. After a successful decade of coalition government again it has entered into a single dominance party system. Henceforth again, political analyst can observed the change in the political contours of the nation and so is the question of federation and granting the status of state autonomy.

2.8 Self Assessment Question

1) What were the demands by the state regarding advocating for state autonomy?
2) Explain the reasons behind fall out between Centre-State relationships.
3) Explain the reason behind the making of a powerful Central government by the framers of Indian constitution.
4) Elucidate R.S Sarkaria Commission Report. Why is it considered to be a vital one?
5) Elucidate the role of the Governor cited by the R.S Sarkaria .
6) Explain the recommendation by Justice M.N Venkatchalliah.
7) Mention the positive aspect behind granting of state autonomy?
8) What are the parameters to be judged before considering for status of state autonomy?
9) What were some of the recommendations of Justice M.M. Punchi Commission.

2.9 Suggested Readings

i. Banerjee, Sumanta. (2000). Beyond the Autonomy Debate . *Economic and Political Weekly , 35* (30), 2605-2606.

ii. Shakir, Moin. (1986). *State and Politics in Contemporary India.* Delhi: Ajanta.

পাঠক্রম : 2.2

Unit-3

সামাজিক ন্যায়, পিতৃতন্ত্র ও ভারতীয় রাষ্ট্র
(Social Justice, Patriachy and the Indian State)

বিষয়সূচী :

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ সামাজিক ন্যায়বিচার ও পিতৃতন্ত্র

৩.৪ পরাধীন ভারতে নারীবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের লড়াই

৩.৫ স্বাধীন ভারতে নারীবাদ এবং সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার

৩.৬ সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমে হিসাবে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

৩.৭ উপসংহার

৩.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৩.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পিততান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে অন্তর্ভুক্তি মূলক সমাজে গঠন করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্তি মূলক সমাজের অন্তনির্হিত মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নারীর প্রতি বৈষম্য দূর, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সকল প্রকার অসমতা দূর করা, সমাজ বা রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মূল্যায়ণে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভারতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় যেখানে পুরুষেরা প্রাথমিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং রাজনৈতিক নৈতৃত্ব নৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক সুবিধা ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করে, পরিবারের ক্ষেত্রে পিতা ও পিতৃতুল্যগণ নারী ও শিশুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। আমাদের সংবিধানে এমন সব বিধান রয়েছে বা দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সাযুয্য রেখে ভারত সরকার এমন অনেক আইন প্রণয়ন করেছে যাতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এই এককের মাধ্যমে ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক সংবিধি ও আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে সে বিষয়ে জানা যাবে।

৩.২ ভূমিকা

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের অধিকার বিসর্জিত। নারীরা তাদের যোগ্যতা, প্রতিভার বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ থেকে ক্রমে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান, তার মেধা ও শ্রমকে শক্তিতে রূপান্তর করে এবং তার স্ব-নির্ভরশীলতাকে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে সারা বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। রাষ্ট্রপুঞ্জ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'বিশ্ব নারী বর্ষ' ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে।১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে ১৯৮৫ সাল নাইরোবিতে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৩ সামাজিক ন্যায়বিচার ও পিতৃতন্ত্র :

সামাজিক ন্যায় বিচার তথা ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারীদের জন্য প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা অপসারণ জরুরি। যে কাঠামোগত অসমতা নারীদের একটি নিপীড়ত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে অসুবিধাজনক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে সেই কাঠামোগত অসমতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সামাজিক ন্যায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে, সামাজিক ন্যায় বা ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন, চিহ্নিন্তকরণও বিলোপ সাধনের জন্য এক জোট হয়।

সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে কিছু অন্তরায় থেকে যায়। যেমন—

সামাজিক কারণ : সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে এক ধরনের বোঝা মনে করা হয়। তারা পারিবারিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে বড় হতে থাকে। তারপর সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বামীর সংসারে আসার পরও তারা অবহেলা, অবজ্ঞা ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। নারীকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলা হয়। কিন্তু সমাজে নারীরর অবদানকে কখনোই মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে তারা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে।

রাজনৈতিক কারণ : সমাজবিজ্ঞানী ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা তিনটি কারণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সেগুলো হল— (ক) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা, (খ) কম শিক্ষিত এবং (গ) হীনমন্যতা ও প্রাচীন মনোভাব। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে দেখা হয়। শিক্ষার অভাবে আত্মবিশ্বাস কম থাকায় নারী আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং সমর্থন না থাকায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

অর্থনৈতিক কারণ : প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Easter Bosemp তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Womens Role in Economic Development"-এ নারীর অন্যতম শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যকে নির্দেশ করেছেন। বাংলাদেশের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী শতকরা ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। কর্মক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অএনক পিছিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া সংসারে নারীর শ্রম বিনিময়ের কোনো মাপকাঠি উদ্ভাবিত হয়নি।

শিক্ষার অভাব : নেপোলিয়ন বলেছেন—''আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি দিব।" কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত নারী সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ। শিক্ষার অভাবে নারী তার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। এটি নারীর ক্ষমতায়নের অনেক বড় অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন। নারীবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী পিতৃতন্ত্রকে সাধারণত একটি সামাজিক নির্মাণ হিসেবে

দেখা হয়, যাকে এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশের উন্মুক্তকরণ এবং সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পরাভূত করা সম্ভব হবে। বারবার স্মাট মনে করেন, মানুষে পিতৃতন্ত্র বিবর্তিত হয়েছে পুরুষের প্রজনন গত আকর্ষণ এবং নারীর প্রজননগত আকর্ষণের কারণে। তিনি ছয়টি কারণকে তালিকাভুক্ত করেছেন :

1. নারী-নারীতে বন্ধুত্ব হ্রাস পাওয়া
2. পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া
3. পুরুষের খাদ্যে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়া
4. পুরুষের অভ্যন্তরে যাজক শ্রেণি গড়ে উঠা
5. নারীর কৌশলগত অবস্থান যাতে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব ফলায়
6. ভাষার বিবর্তন হওয়ার দরুণ মতবাদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা

জাতিসংঘ সামাজিক ন্যায় বা ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলে। স্তরগুলো উর্ধ্বক্রম অনুসারে নিম্নরূপ :

সামাজিক ন্যায় বা ক্ষমতায়ন (Empowerment)
↓
নিয়ন্ত্রণ (Control)
↓
অংশগ্রহণ (Participation)
↓
নারী জাগরণ (Conscientisation)
↓
নারী সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণে অবাধ সুযোগ ও অধিকার (Access)
↓
কল্যাণ (Welfare)

বৈষম্য ও নির্যাতনের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ঐতিহাসিকভাবে নারীকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে পুরুষ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যদি নারীর সুযোগকে এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মল নাও করা যায়, অন্তত এটাকে এর মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে, আর এর ফলস্বরূপ নারীর জীবন হয়েছে সীমাবদ্ধ। তাই নারী আন্দোলন, সাংবিধানিক প্রবিধান ও আইনি ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে।

৩.৪ পরাধীন ভারতে নারীবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের লড়াই :

ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক কাল থেকে সতী, পর্দা, স্থায়ী বৈধব্য ইত্যাদি পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়নমূলক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ভারতের নারীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন বিরোধী স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাতে শিক্ষিত নারীদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীদের অধিকার সচেতনতা, এবং যৌথভাবে সংগঠিত হয়ে দাবি-দাওয়ার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতেও সেগুলো নারীমুক্তির মূল শত্রু শোষণ-নিপীড়নমূলক সামন্তবাদী পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে সংগঠিত হয়নি।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে এবং আরও অনেক সমাজ সংস্কারকে নারীদের উন্নয়নের জন্য লড়াই করেছিলেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ইয়ং বেঙ্গল-এর সদস্য পিয়ারি চরণ সরকার, ১৮৪৭ সালে কলকাতার শহরতলি বারাসতে ভারতের প্রথম অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। (পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি কালীকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুলে নামে পরিচিতি লাভ করে)।

যদিও ব্রিটিশ রাজত্বকালে বহুক্ষেত্রেই ইংরেজদের কোনও ইতিবাচক অবদান ছিল না, তবে এর বিপরীত ঘটনাও আছে। ক্রিশ্চন ধর্ম প্রচারকের (missionary) স্ত্রী মার্থা মোল্ট মিয়েড এবং তার কন্যা এলিজা ক্যান্ডওয়েল মোল্ট দক্ষিণ ভারতে মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার পথিকৃত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই প্রচেষ্টা তৎকালীন প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধী হওয়ায় প্রাথমিকভাবে স্থানীয় প্রতিরোধের মুখে পড়ে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম ক্যভেণ্ডিশ বেন্টিঙ্কের কার্যকালে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। বিধবাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। নারী মুক্তি আন্দোলন পণ্ডিত রমারাঈ এর মতো অনেক মহিলা সমাজ সংস্কারকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মহারাষ্ট্রে প্রথম মহিলাদের অধিকার ও শিক্ষার দাবিতে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয় মহিলাদের দ্বারাই। সাবিত্রীবাঈ ফুলে ভারতের প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু করেন। তারাবাঈ সিন্ধে প্রথম নারীবাদী লেখা লেখেন এবং পন্ডিতা রামবাঈ হিন্দু ধর্মের জাতপাত প্রথার কঠোর সমালোচনা করেন ও নিজে জাতের বাইরে বেরিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে বাংলার নবজাগরণের ফলে হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি, বিধবা বিবাহ, শিশু বিবাহ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সম্পত্তিতে আইনগত অধিকার এবং সন্তান দত্তক, নেওয়ার অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন চলছিল, নারীবাদী আন্দোলন তার ফলে অনেকটাই অক্সিজেন পায়। ১৮৬৬ সালে নারীবাদী কবি কামিনী রায় ভারতের প্রথম অনার্স গ্র্যাজুয়েট হন। এমন কি সেই ব্রিটিশ আমলেও কয়েকটি রাজ্য মহিলা শাসিত ছিল। যেমন ঝাঁসির বাণী লক্ষ্মীবাঈ, কিট্টুরের রাণী চেন্নামা, ভোপালের কুদিসা বেগম, পাঞ্জাবের জিন্দ কৌর প্রভৃতি। বিশ শতকের সূচনায় বাংলার বুকে বিপ্লব বাদের পদ ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। প্রথমদিকে ভগ্নিনিবেদিতা এবং সরলাদেবী চৌধুরীর মতো প্রমুখ নারীদের গোপন যোগাযোগ থাকলেও সাধারণভাবে মেয়েদের এসব কর্মকান্ড থেকে দুরে রাখা হত। তবে মেয়েরা মা, বোন স্ত্রী হিসাবে বহুক্ষেত্রে তারা পলাতক বিপ্লবীদের গোপনে আশ্রয় দিতেন, পিস্তল বা রিভলবার লুকিয়ে রাখতেন বা অন্যত্র পৌঁছে দিতেন, এমনকি গোপনে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন। এই ধরনের আন্দোলনে যে সমস্ত নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বীরভূমের দুকড়িবালাদেবী, যিনি নিজের বাড়িতে রডা কোম্পানির ৭টি পিস্তল ও এক বাক্স কার্তুজ লুকিয়ে রাখার অভিযোগে ২ বছরের জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

সরোজিনী নাইডু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রথম সারিতে ছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। তিনিই প্রথম কংগ্রেসের বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর তিনি আগ্রার গভর্ণর নিযুক্ত হন। অরুণা আসফ আলি গান্ধীজির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেত্রী এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম মুখ। ১৯৩২ সালে তিহার জেলে বন্দি থাকাকালে তিনি জেলের ভেতরেই বন্দিদের সঠিক চিকিৎসার দাবি করে অনশন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় তার দাবি মেনে নিতে। হাওড়ার বাল বিধবা ননী বাবাদেবী পলাতক বিপ্লবিদের আশ্রয় দিতেন যার জন্য তাকে ১৮১৮ সালে রাজবন্দি করা হয়। এছাড়াও অনেক উদাহরণ আছে যে মেয়েরা নিজ শক্তিতে বলীয়ন হয়ে নিজেরাই বিপ্লব কর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় লীলা নাগের (১৯০০-৭৯ খ্রি:) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি সংঘ'র কথা বলা যায়। নারী জাগরণ ও নারীদের আত্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের বেশ কিছু কর্মধারা ও শাখা সংগঠন ছিল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' ঢাকা ও কলকাতায় ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চয় করেছিল। এটি ছিল ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন।

বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-৩২ খ্রি:) ও কল্পনা দত্ত (১৯১৩-৯৫ খ্রি:), বেণীমাধব দাসের কন্যা বীণাদাসের (১৯১১-৮৬ খ্রি:) অবদান ভুলবার নয়। চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশে এই দুই অগ্নি কন্যা চট্টগ্রামে পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এক সপ্তাহ আগেই কল্পনা দত্ত গ্রেফতার হয়ে যান এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই অভিযান শেষ পর্যন্ত সফল করেন। কিন্তু তিনি পুলিশের হাতে ধরা না দেওয়ায় আত্মহত্যা করেছিলেন।

এরপর গান্ধীজি পর্দা প্রথা সরিয়ে মেয়েদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হতে ডাক দেন। ১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত প্রথম নারী প্রতিনিধিদল নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি নিয়ে রাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ১৯২৭ সালে পুনেতে নিখিল ভারত নারীশিক্ষা বিষয়ক আলোচনাচক্র (অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি সামাজিক উন্নয়ণমূলক আন্দোলনের একটি প্রধান সংগঠন হয়ে ওঠে। ১৯২৯ সালে বাল্য বিবাহ নিবর্তন আইন পাস হয়, যেখানে একটি মেয়ের বিয়ে করার ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর বে স্থির করা হয়। যদিও মহাত্মা গান্ধী নিজে তেরো বছর বয়সে বিবাহ করেন, পরে তিনি বাল্য বিবাহ বর্জন করার জন্য এবং ব্যাল-বিধবাদের বিয়ে করার জন্য এবং ব্যাল বিধবাদের বিয়ে করার জন্য দেশের যুবকদের আহ্বান জানান। সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও মেয়েদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এই সময়েই অল ইন্ডিয়া উওমেন্স কনফারেন্স (AICW) এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উওমেন এই দুটি সংস্থা তৈরি হয়। ১৯২০ সাল থেকে প্রকৃত অর্থে ফেমিনিজম মুভমেন্ট চালু হয়। স্থানীয় মহিলারা, নিজেদের সংগঠন তৈরি করে মেয়েদের শিক্ষা, খেটে খাওয়া মহিলাদের কাজের জগতে সুরক্ষা ও সমতার জন্য লড়াই শুরু করে। জাতীয় পর্যায়ে গান্ধীজির আওতায় থেকে AICW-র মহিলা সদস্যরা বিভিন্ন রকম আন্দোলন যুক্ত হয়। ১৯৩০ সালে এভাবেই আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে যায়। ১৯৪০-এর দশকে তেভাগা কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নিপীড়িত গরিব কৃষক নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উচ্চমাত্রার। তখন রাষ্ট্রীয় দমনের পাল্টা আক্রমণের জন্য 'নারীবাহিনী' গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-তে তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক উত্থান গড়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যক নারীরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। কৃষক ও আদিবাসী নারীগণ গেরিলা স্কোয়াডের সদস্য হয়েছিলেন।

৩.৫ স্বাধীন ভারতে নারীবাদ এবং সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার :

স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও AICW তাদের সংগঠনের কাজ চালু রাখে। ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উওমেন নামে তাদের মহিলা শাখা কাজ শুরু করে। ১৯৬৬ সালে ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৬৬-৭৭ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। চতুর্থবারে ১৯৮০ সালে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হলেও ১৯৮৪ সালে আচমকাই আততায়ীর হাতে নিহত হন। ভারতের সমস্ত রাজ্যে মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য যে আন্দোলন হয়েছে, কেরালার নেত্রীরাই সে বিষয়ে এগিয়ে থেকেছেন। কেরালা সব সময়েই নারীদের সাক্ষরতার হারে, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় এগিয়ে থেকেছে। ১৯৮৮ সালে বিনা আগরওয়ালের এক সমীক্ষা অনুসারে দেখা গেছে, সারা ভারতের মহিলারা যেখানে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় ১৩% হার বজায় রেখেছে, সেখানে কেরালায় এই হারে ২৪%। ১৯৯০-এর দশকে বেশ কিছু বিদেশি সংস্থার অনুদানে কিছু নতুন নারী-কেন্দ্রিক বেসরকারি সংগঠন গড়ে ওঠে। এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং 'স্ব-নিযুক্ত নারী সমিতি' (Self Employed Women's Association বা সেবা)-র মতো বেসরকারি সংগঠন ভারতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে উঠে এসেছেন মেধা পাটেকারের (নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন) মতো বহু প্রভাবশালী নারী।

ভারতে নারীবাদী কর্মকান্ডের সক্রিয়তা ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে গতি লাভ করে। জাতীয় স্তরের যে বিষয়গুলি প্রথম নারীবাদী সংগঠনগুলিকে সংঘবদ্ধ করে মথুরা ধর্ষণ মামলা তাদের মধ্যে একটি। ১৯৭৯-১৯৮০ সালে থানায় ভিতর মথুরা নামের একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা বেকসুর খালাস পাওয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই সমস্ত বিক্ষোভ সরকারকে প্রমাণ সংক্রান্ত আইন (Evidence Act), ফৌজদারী কার্যবিধি (Criminal Procedure Code) এবং ভারতীয় দন্ডবিধির (Indian Penal Code) সংশোধন করতে বাধ্য করে; এবং হেফাজতে থাকাকালীন ধর্ষণ (custodial rape) নামে একটি নতুন অপরাধ নথিবদ্ধ হয়। শিশুকন্যা হত্যা, লিঙ্গ বৈষম্য, নারী স্বাস্থ্য, নারী নিরাপত্তা এবং নারী শিক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়েও নারী আন্দোলনের কর্মীরা একতাবদ্ধ হন।

২০১৪ সালে মুম্বাই ফ্যামিলি কোর্ট একটি রায়ে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ২৭(১)(ডি) ধারা অনুযায়ী একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কুর্তা-জিন্সের বদলে শাড়ি পরতে বাধ্য করানোর কারণে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দেয়। ২০১৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট একটি রায় দেয়, যৌথ পরিবারের সব থেকে বয়স্ক মহিলা পরিবারের 'কর্তা' হিসেবে গন্য হবে। এছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য রায় ঘোষণা করা হয়, যেখানে সন্তান প্রতিপালনে অভিভাবক হিসেবে একজন মা যে কোন প্রতিষ্ঠানে একক স্বীকৃতি পাবেন। বাবার সাক্ষর জরুরি নয় এই ক্ষেত্রে। পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান হিসাবে ভারতীয় সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়। এই সংবিধানে লিঙ্গসাম্য ও নারীর অধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট উল্লেখসহ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমস্ত রকম বৈষম্য নিরসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান সংবিধানে রয়েছে সেগুলি হল :

প্রস্তাবনা : ১৯৭৬ সালের সংশোধিত (৪২তম সংশোধন) প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের সামাজিক, আইর্থ ও রাজনৈতিক ন্যায়: চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠার ও সুযোগের সমানতা লাভ এবং ব্যক্তি মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

১৪ নম্বর ধারা : রাষ্ট্র ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ভিতরে কোন ব্যক্তিকে আইনের কাছে সমানতা থেকে কিম্বা আইনের সমান সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করবে না।

১৫ নম্বর ধারা : কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা এর কোন একটির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করবে না [ধারা-১৫(১)]। নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত হয়েছে [ধারা-১৫(৩)]।

১৬ নম্বর ধারা : রাষ্ট্রের অধীন কোনো চাকরি বা কোনো পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে [ধারা-১৬(১)] । ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান, নিবাস অথবা এর কোন একটির ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের চাকবি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে বৈষম্য করা যাবে না [ধারা-১৬(২)]।

৩৯ নম্বর ধারা : নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত জীবনধারণের সমান অধিকার [ধারা-৩৯(a)]। সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান বেতন পাবার অধিকার [ধারা-৩৯(d)]। ন্যায়বিচার ও বিনাব্যয়ে আইনি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ [ধারা-৩৯(A)] (এটি ২০০২ সালের ৮৬তম সংশোধন দ্বারা যুক্ত হয়েছে)।

৪২ নম্বর ধারা : কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক ব্যবস্থার এবং প্রসূতির সাহায্য/অবকাশ পাওয়ার অধিকার।

৪৬ নম্বর ধারা : তপশিলযুক্ত জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণির শিক্ষাসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করা এবং সামাজিক অবিচার থেকে তাদের রক্ষা করা।

৪৭ নম্বর ধারা : রাষ্ট্রের কর্তব্য হল নাগরিকদের দৈনন্দিন পুষ্টির গ্রহণের মাত্রার, জীবনাযাত্রার ও জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন।

৫১(a)(e) নম্বর ধারা : ধর্মীয়, ভাষাগত আঞ্চলিক অথবা শ্রেণিগত বিভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে সব ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রসারিত করা এবং নারীদের প্রতি মর্যাদাহানিকর সব প্রথাকে পরিহার করা।

২৪৩ নম্বর ধারা : পঞ্চায়েত ও পৌরসভার প্রতিটি স্তরে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তপশিলি জাতি উপজাতি মানুষদের জন্য নিজ নিজ গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত হবে। তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনের এক-তৃতীয়াংশ ওই সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হওয়ার নিয়ম গৃহীত হবে [পঞ্চায়েত-ধারা ২৪৩ (D)(৩); পৌরসভা -ধারা ২৪৩ (T)(৩)]। পঞ্চায়ের প্রতি স্তরে মহিলা পদাধিকারীদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না [ধারা-২৪৩ (D)(৪)]। পৌরসভায় তপশিলি জাতি-উপজাতি ও মহিলা পদাধিকারীর সংখ্যা প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য আইনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারবে [ধারা-২৪৩ (T)(৪)]।

● **আইনি সুরক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন তথা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস :**

ভারতীয় নারীদের ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা, ন্যায় বিচার, সাম্য, বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি কারণ কে সামনে রেখে বেশ কিছু আইনগত সংস্থান রয়েছে। আইনি সুরক্ষা অবশ্যই নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তার একটি অন্যতম দিক। উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র আইনিগুলি হল :

■ **বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য প্রণীত আইন :**

১) ভারতীয় দন্ডবিধি (The Indian Penal Code), ১৮৬০ (বিশেষ করে Sec, 498A IPC)।

২) অবৈধ পাচার (নিয়ন্ত্রণ) আইন {The Immoral Traffic (Prevention) Act}, ১৯৫৬।

৩) প্রসূতিদের সুবিধার্থে প্রণীত আইন (The Maternity Benefit Act), ১৯৬১।

৪) পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন (The Dowry Prohibition Act), ১৯৬১ (সংশোধিত হয়েছে, ১৯৮৬)।

৫) চিকিৎসার কারণে গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন (The Medical Termination of Pregnancy Act), ১৯৭১।

৬) মুসলিম নারীর পণ অধিকার সুরক্ষা আইন (The Muslim Women Protection of Right ১৯৮৬।

৭) মহিলাদের অশ্লীল প্রদর্শন (নিষিদ্ধকরণ) আইন {The Indecent Represention of Women (Prohibition) Act}, ১৯৮৬।

৮) সতী প্রথা (নিবারণ) আইন {TheCommission of Sati (Prevention) Act}, ১৯৮৭।

৯) গর্ভস্থ ভ্রূণ পরীক্ষা নিরীক্ষা (নিয়ন্ত্রণ ও অপব্যবহার রোধ) আইন {The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act}, ১৯৯৪।

১০) পারিবারিক হিংসা সুরক্ষা আইন (Protection of Women from Domistic Violance Act), ২০০৫।

১১) শিশু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (The Prohibition of Child Marriage Act), ২০০৬।

১২) যৌন অপরাধসমূহ থেকে শিশুদের সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন (The Protection of Children from Sexual Offences Act), ২০১২।

১৩) কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, বিরোধিতা ও প্রতিবিধানের) থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন {The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act}, ২০১৩।

১৪) প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, ২০১৫।

১৫) বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ২০১৫।

১৬) মহিলা আধিকারিকদের জন স্থায়ী কমিশন, ২০১৯।

১৭) প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, ২০১৬।

১৮) তিন তালাক আইন, ২০১৯ প্রভৃতি।

এছাড়া, নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত এবং বিবাহ ও উত্তারাধিকার সম্পর্কিত একগুচ্ছ আইনের মাধ্যমেও মহিলাদের অধিকার সম্প্রসারিত করার প্রয়াস করা হয়েছে।

■ **অর্থনীতি-সম্পর্কিত আইন :**

১) ফ্যাক্টরি আইন (The Factories Act), ১৯৪৮।

২) কর্মচারি রাজ্য বিমা আইন (The Employees State Insurance Act), ১৯৪৮।

৩) ন্যূনতম মজুরি আইন (The Minimum Wages Act), ১৯৪৮ এবং ১৯৫০।

৪) খনি আইন (The Mines Act), ১৯৫২।

৫) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (The Hindu Succession Act), ১৯৫৬।

৬) চুক্তি শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন {The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act}, ১৯৭০।

৭) সমান পারিশ্রমিক আইন (The Equal Remuneration Act), ১৯৭৬।

৮) দাস শ্রমিক (বিলোপ) আইন {The Bonded Labour System (Abolition) Act}, ১৯৭৯।

৯) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act), ২০০৫।

১০) ফৌজদারি আইন (সংশোধন) আইন {The Criminal Law (Amendment) Act}, ২০১৩।

■ **সামাজিক আইন :**

১) ভারতীয় খ্রিস্টান বিবাহ আইন (The Indian Christian Marriage Act), ১৮৭২।

২) ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (The Indian Succession Act), ১৯২৫।

৩) বিশেষ বিবাহ আইন (The Special Marriage Act), ১৯৫৪।

৪) হিন্দু বিবাহ আইন (The Hindu Marriage Act), ১৯৫৫।

৫) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (The Hindu Succession Act), ১৯৫৬ (সংশোধিত হয়েছে, ২০০৫)।

৬) ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন (The Indian Divorce Act), ১৯৬৯।

৭) বৈদেশিক বিবাহ আইন (The Foreign Marriage Act), ১৯৬৯।

৮) পারিবারিক আদালত আইন (The Family Courts Act), ১৯৮৪।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় :

১৯৮০-৮৫ অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Women an Development নামক একটি পৃথক স্বতন্ত্র অধ্যায় যুক্ত হয়। যা নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ ছিল। এর পর অর্থাৎ সপ্তম পরিকল্পনা থেকে নারীদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে আলাদা-আলাদা ব্যয় বরাদ্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উল্লেখ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো সংস্থান না থাকলে গ্রামীণ বিকাশের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল বা নারী মন্ডল নামক মহিলা গোষ্ঠীর গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ পরোক্ষ মহিলাদের সামাজিক ন্যায় প্রদানে ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষা এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করাহয়, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উক্ত পরিষেবা ও নারী শিক্ষার উন্নতি জন্য বহুবিষয় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়। সপ্তম পরিকল্পনা কালে নারীদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ২৭টি প্রকল্পের রূপায়ণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অষ্টম পরিকল্পনাকালে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। নবম পরিকল্পনায় 'সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠাসহ বিকাশ'কে লক্ষ্য স্থির করে প্রকল্প অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ৩০ শতাংশ অর্থ আলাদা করে রাখার সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে স্ব-শক্তি (১৯৯৮), স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা (১৯৯৯), স্বয়ংসিদ্ধা (২০০১) প্রভৃতি প্রকল্প কার্যকর হয়। ২০০১ সালেই "National Policy for Empowerment of Women" গৃহীত হয়। সেখানে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (সামাজিক ও অর্থনৈতিক) গুলি নায্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তী পরিকল্পনা গুলিতে জেন্ডার বাজেট, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য, স্ব-রোজগার যোজনা, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, বিশেষ স্বলারশিপ, সুষম বিকাশ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরপর নীতি আয়োগ গঠিত হলে চাষাবাদ, সম্পত্তির যৌথ মালিকানা, মহিলা উদ্যোগীদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষার ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূরীকরণ প্রভৃতি উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সাময়িক ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। ১৯৯২ সাল থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী চিকিৎসা বা শুশ্রুষা সংক্রান্ত নয় এমন পদেও মহিলাদের নিয়োগ করা শুরু করে। ১৯৯২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী নারী অধিকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ নারী অধিকর্তা নিয়োগ শুরু করে। ২০১৭ সালের ২৫ মার্চ, তনুশ্রী পারেখ বিএসএফ-র প্রথম মহিলা সামরিক আধিকারিক (Combat Officer) নিযুক্ত হন।

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার যোঘণা করেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ)-এ মহিলারা যোদ্ধা বিমানচালক হিসেবে কাজ করতে পারবেন, যার আগে মহিলাদের কেবলমাত্র পণ্যবাহী বিমান ও হেলিকপ্টার চালানোর অনুমতি ছিল। সিদ্ধান্তটির ফলে মহিলারা বিমান বাহিনীর যেকোনও পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। ২০১৬ সালে ভারত সরকার তার একটি ঘোষণায় সেনা এবং নৌবাহিনীর সব বিভাগে নারীদের যুদ্ধক্ষেত্র অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়। ২০১৪ সালের হিসাবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩% নৌবাহিনীর ২.৮% এবং বিমান বাহিনীর ৮.৫% সদস্য মহিলা। ২০১৬ সালের হিসাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সকল সক্রিয় এবং সংরক্ষিত বাহিনীর ৫% নারী।

৩.৬ সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যম হিসাবে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ :

২০১১ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রূঢ় বাস্তব সামনে নিয়ে এসেছে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন বা আইপিইউ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান ৯৮। ভারতবর্ষকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু, বিশ্বের বৃহত্তম এই গণতন্ত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের চিত্রটা কতটা করুণ তা একটি হিসেব দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, লোকসভায় মোট ৫৪৪ জন সদ্যসের মধ্যে মহিলা সংখ্যা মাত্র ৬০। বর্তমানে এই সংখ্যা ৭৮। আর রাজসভায় ২৪২ জনের মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন ২৬ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা ২৭। শতকরা হিসেবে নিম্নকক্ষে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ২২.২ শতাংশ এবং উচ্চকক্ষে তা ১৭ শতাংশ। পাকিস্তানের সংসদে এই হিসেব শতকরা ৩৩.৩ ভাগ। তালিকায় পাকিস্তানের স্থান ভারতের তুলনায় ৪৭ ধাপ এগিয়ে,আর নেপাল এগিয়ে ৮০ ধাপ। ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এই সমীক্ষাটি গত ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। আন্তজাতিক সংস্থাটির সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের সঙ্গে একই স্থানে রয়েছে বেনিন ও জর্ডন। তুলনায় এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ এবং এশিয়ার অর্থনীতিতে ভারতের প্রবল প্রতিযোগী চিনও। চিনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ২১.৩ ভাগ। তালিকায় চিনের স্থান ৫৫। আর জাতীয় রাজনীতিতে ১৮.৬ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বাংলাদেশ রয়েছে ৬৫তম স্থানে। প্রতিবেশীদের মধ্যে শ্রীলঙ্কা এবং মায়নমারই ভারতের তুলনায় পিছিয়ে। তবে বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি নারী রাজনীতিবিদ আছেন, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী লোকসভার স্পিকার, বিরোধী দলনেতাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলারা বিভিন্ন সময় দায়িত্ব সামলেছেন। সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের মাধমে ভারতের সকল রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে পরিশ্চমবঙ্গসহ বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে নারীদের জন্য পি.আর.আইগুলিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতগুলি বেশিরভাগ প্রার্থীই নারী। বর্তমানে (২০১৫ সালে) কেরালার কোদাসেরী পঞ্চায়েতের সকল নির্বাচিত সদস্যই মহিলা। বর্তমানে ভারতের একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। ২০১৬ সাল পর্যন্ত হিসাবে ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ১২টিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে স্বাধীনতার পর থেকে কমপক্ষে একজন করে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

৩.৭ উপসংহার :

তথ্য কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। জাতীয় অপরাধ নিবন্ধীকরণ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট (২০১১) অনুযায়ী, ভারতে প্রতি তিন মিনিটে কে জন মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটছে। প্রতি ২৯ মিনিটে এক জন মহিলা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। প্রতি ৭৭ মিনিটে একজন ননারী পণপ্রথার বলি হন। পণের দাবিতে অত্যাচারে ২০১১-তে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ৮,৬১৮টি।

ইউনিসেফ-এর ২০০৯ সালের একটিরিপোর্ট অনুযায়ী, ৪৭ শতাংশ ভারতীয় মহিলার ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে এই হার প্রায় ৫৬ শতাংশ। থমসন রয়টার্সের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত মহিলাদের জন্য বিশ্বের চতুর্থ বিপজ্জনক দেশ। রিপোর্টটিতে ভারত জি-২০ দেশগুলির মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর দেশ হিসেবেও উল্লিখিত হয়, তবে এই রিপোর্টটি ভ্রান্তিযুক্ত হওয়ার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ৯ মার্চ ২০১০ তারিখে, আন্তজ৪াতিক মহিলা দিবসের একদিনের পর, রাজ্যসভার মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হয়, যা ভারতের সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে

মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করে। ২০১৭ সালে থমসন রয়টার্স কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় অনুযায়ী দিল্লি মহিলাদের জন্য চতুর্থ বিপজ্জনকতম মহানগর (বিশ্বের ৪০টি মহানগরের মধ্যে) এবং মহিলাদের উপর যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হয়রারির ঝুঁকিতে এটি বিপজ্জনকতম মহানগর।

নারীদের স্বাধিকার তথা সামাজিক ন্যায়ের বিষয়টি এখনও অনেকটাই অধরা। ৪১ শতাংশ মেয়েদের নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। এদের মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ মেয়ে বিয়ের আগে স্বামীকে জানার সুযোগ পায়। এদিক দিয়ে আমরা তেমন উন্নতি করতে পারিনি। মেয়েদের বিয়েতে মত দেওয়ার অধিকার তখনই বাড়ে যখন আর্থিক উন্নতি হয়, শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটে, শহরের সম্প্রসারণ হয়। এ ব্যাপারে দক্ষিণের রাজ্যগুলি অনেকটাই এগিয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী মাত্র ১০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছে, বাড়িতে বড় কিছু কেনার আগে তাদের মতামত নেওয়া হয়, ২০ শতাংশেরও কম মহিলার বাড়ির দলিলে নাম আছে, ৮১ শতাংশ মহিলাকে চিকিৎসক দেখাতে গেলে বাড়ির লোকজনের অনুমতি নিতে হয়। ৬০ শতাংশ মহিলার, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশ উচ্চ হিন্দু জাতির ও ৮৩ শতাংশ মুসলিম, জীবন কাটে ঘোমটা বা পর্দার আড়ালে। অর্ধেকেরও বেশি মহিলা জানিয়েছেন অনুমতি না নিয়ে বাড়ির বাইরে গেলে তাঁদের মার খেতে হয়।

গড়পড়তা ভারতীয় পরিবার পণ হিসাবে গড়ে ৩০ হাজার টাকা দেয়। ৪০ শতাংশ মহিলাই জানিয়েছেন, তাঁদের বিয়ের ক্ষেত্রে টিভি বা গাড়ির মতো পণ্য পণ দিতে হয়েছে। দরিদ্রতম গ্রামেও বিয়ের খরচ ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা।

এখনও বেশির ভাগ মানুষের কাছে মেয়ে মানে দায়—'কন্যাদায়', যার একমাত্র সমাধান বিয়ে। তা সে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা না হোক, কী যায় আসে! তাই এখনও বেশির ভাগ পরিবারে পুত্রসন্তানই কাম্য। এখনও চলেছে দেদার কন্যাভ্রূণ হত্যা। শ্বাস নেওয়া তো দূরের কথা, জন্মের আগেই মেয়েদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এ তো সভ্যতার নিদারুণ লজ্জা!

২০১১-র আদমসুমারি অনুযায়ী, নারীশিক্ষার হারবৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পুরুষদের শিক্ষার হার যেখানে ৮২ শতাংশ, সেখানে নারীশিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ। এই হার উচ্চশিক্ষায় আরও কম। বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য—বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীশিক্ষার প্রসার। কন্যাশ্রী প্রকল্পটি রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক সম্মনিতও হয়েছে।

কিন্তু শুধু সরকারি অনুদান সার্বিক নারী প্রগতি ঘটাতে পারে না, পারছেও না। দেখা যাচ্ছে, কন্যাশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য অনেক বাবা-মা অপেক্ষা করে আচ্ছেন। টাকা মিললেই বিয়ের আয়োজন করছেন। সুতরাং যা শিক্ষার জন্য খরচ হওয়ার কথা, তা অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের খরচে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে সচেতনার অভাব ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, সিনেমা, টিভির ধারাবাহিক—সব ক্ষেত্রেই আধুনিকতার মোড়কে আমরা অনেকেই পুরনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধারণাগুলি বহন করে চলেছি। এখন 'বিউটি' বা 'ফেয়ারনেস' ক্রিমের বিজ্ঞাপনে গায়ে রং ফরসা না হলেমেয়ের বিয়ে বারবার ভেঙে যাচ্ছে। এখনও বিজ্ঞাপনের মেয়েটি নজর কাড়ার জন্য ফর্সা হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এখনও বাসন মাজার সাবানে বিজ্ঞাপনে গৃহিনীদেরই উপস্থিতি। অন্য দিকে, বিশেষ কোম্পানির চার চাকার গাড়ি চালাচ্ছেন পুরুষ মডেল। দিনভর সংসারে কাজ করে বৌমা ক্লান্ত হয়ে ব্যথা উপশমকারী মলমের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কখনও আবার বিশেষ মশলা ব্যবহার করেবাড়ির জন্য রান্না করে শ্বশুরের মন জিতে নিচ্ছেন বৌমা। পুরুষেরা বিশেষ 'ডিওডোরেন্ট' ব্যবহার করার ফলে নারীরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যাচ্ছেন। চিন্তাভাবনার এই একমাত্রিকতা ভাবাতেই পারে এখনও নারীরা যেন ভোগের সামগ্রী মাত্র, অন্তত সেভাবেই তাকে তুলে ধরা হচ্ছে। তা সে সচেতনভাবে হোক বা অসচেতন

ভাবে। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪২ সালে ছারাবস্তায় নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ভারতীয় নারীরা যেন বস্তুসামগ্রী—তারা আসবাবপত্রের মতো। তারা শুধু ভোগের উপকরণ মাত্র।

৩.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী :

i) Write a brief note on the constitutional rights for implementing social justice for Indian Women.
ii) Discuss thebasic reasons ceases the implementation of the provisions for social justice.
iii) What are the basic pillars of social justice as described by UNO? Discuss in Indian Concent.
iv) Examine the role of Women in Indian freedom movement.
v) Analyse the women movement in post, independance Indian.
vi) Evaluate the legal provisions forsocial justice in India for the cloment of Women.
vii) How in different plan period social justice for women incorporated? Discuss briefly.
viii) Discuss about the women participation in Indian Politics.

৩.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

i. Chaudhuri, Maitreyee. (Ed.). (2005). *Women Across Asia.* Zed Books.
ii. Menon, M.K. (2013). *Empowerment of Women in India.* Discovery .
iii. Menon, Nivedita. (Ed.). (1999). *Gender and Politics in India* . Delhi: Oxford University Press .
iv. Roy, Kalpana. (1999). *Women in Indian Politics.* Rajat.

পাঠক্রম : 2.2

Unit-4

দলত্যাগের রাজনীতি এবং দলত্যাগ বিরোধী আইন (Politics and Defection and Anti-Defection Law)

বিষয়সূচী :

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ রাজনৈতিক দলত্যাগের অর্থ ও ভারতে রাজনৈতিক দলত্যাগের ইতিহাস

৪.৪ দলত্যাগ বিরোধী আইন

৪.৪.১ ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিষয়বস্তু

৪.৪.২ ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের মূল্যায়ন

৪.৪.৩ দলত্যাগ বিরোধ সংক্রান্ত ৯১তম সংবিধান সংশোধন আইন, ২০০৩

৪.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে—

ক) ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলত্যাগ ও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

খ) ১৯৮৫ সালের দলত্যাগ বিরোধী আইন ও তার মূল্যায়ন

৪.২ ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের মাধ্যমে যে প্রার্থী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান। তিনি আইনসভায় নির্বাচিত হয়, এইভাবে যে রাজনৈতিক দল বা একাধিক দল নিয়ে গঠিত সংযুক্ত দলীয় ফ্রন্ট বা কোয়লিশন নিরঙ্কুশ সংখ্যগরিষ্ঠতা পায় তখন সেই দল বা সংযুক্ত দলীয় ফ্রন্ট সরকার গঠন করে।

আর এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তখনই সফল ও সর্থক হতে পারে যখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জাতীয় স্বার্থ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নিজেদের নিযুক্ত করে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যে জাতীয় স্বার্থ ও উন্নতির জন্য সঙ্কীর্ণতার উদ্ধে উঠে নিজেদের কতর্ব পরায়ন হতে হবে তার পরিচয় ও প্রকাশ বাস্তবে ব্যাহত হতে দেখা গিয়েছে।

নির্বাচকমন্ডলী নির্বাচনে কোনও দলের প্রার্থীকে যখন ভোট দেয় তখন সেই দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও জনগণের স্বার্থর যথার্থ সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করে।

স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচিত প্রার্থী যখন নির্বাচিত হওয়ার পর তার দলের বা সরকারের অন্যায় কাজ কর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেই দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান বা দল ত্যাগ করতে প্রয়াসী হন। তাহলে সেক্ষেত্রে সেই দলত্যাগের যৌক্তিকতা বিচার্য, কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধরা অন্যায় ভাবে আর্থিক সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর নিজ দলের থেকে নিজেকে সরিয়ে নতে তৎপর হয়।

যদি সেই দল সতিই অন্যায় কাজ করে বা সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই দলের আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির দলত্যগের যৌক্তিকতা স্বীকার্য, কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় ক্ষমত লাভের জন্য ওই নির্বাচিত প্রার্থীয় দলত্যাগের প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

এই দলত্যাগের বিষয়টি পৃথিবীর প্রায় সব গণতান্ত্রিক কাঠামোযুক্ত দেশে কম বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই অন্যায়ভাবে দলত্যাগের বিষয়টিও এখানে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

৪.৩ রাজনৈতিক দলত্যাগের অর্থ ও ভারতে রাজনৈতিক দলত্যাগের ইতিহাস

Consise Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে 'দলত্যাগ' (Defction) শব্দটির অর্থ হল (i) কারও কোনও দেশকে পরিত্যাগ করা, (ii) রাজনীতিতে কোনও নেতা, দল, ধর্ম বা কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যের (allegiance) অবসান।

ডঃ এস. সি. কাশ্যপ (Dr. S. C. Kashyap) বলেছেন যে রাজনীতিতে পরিত্যাগ বিষয়টির অর্থ হল কোনও রজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বেরিয়ে আসা এবং এই 'রাজনৈতিক পরিত্যাগ' (Political defection) নিম্নলিখিতভাবে দেখা দিতে পারে—ক) একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের টিকিটে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর সেই নির্বাচিত সদস্য যখন অন্য একটি দলের যোগ দেয়। (খ) আইনসভায় সদস্য হওয়ার পর নিজ দল থেকে পদত্যাগ করে কিন্তু একজন নির্দল সদস্য হিসেবে পদত্যাগ করে, কিন্তু একজন নির্দল সদস্য হিসেবে অবস্থান করে। (গ) একজন নির্দল হিসেবে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার পরে একটি রাজনৈতিক দলে যোগদান করে, (ঘ) কোনও রাজনৈতিক দল থেকে আইনসভায় নির্বাচিত সদস্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজ রাজনৈতিক দলের নির্দেশ আন্য করে বিরুদ্ধে ভোট দেয় —যেমন অনাস্থা প্রস্তাব (No confidence motion) বা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব (Confidence motion) (ঙ) নিজদল থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর নিজদল থেকে বেরিয়ে এসে অন্য একটি দল বা গোষ্ঠী গঠন করে, (চ) আইনসভায় নিজের দল থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন দল তৈরি করা এবং পরে নিজের আগের দলের সঙ্গে অথবা অন্য দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়।

এই রাজনৈতিক দলত্যাগ বা দল থেকে বেরিয়ে আসার (difection) বিষয়টি যেমন আদর্শগত হতে পারে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও পদের জন্য বা আর্থিক ও বৈষায়িক ক্ষেত্রে সুবিধাদি পাওয়ার জন্যও ঘটতে পারে।

রাজনৈতিক ও আদর্শগত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির দলত্যাগের নজির হিসেবে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে গ্ল্যাডস্টোন এবং চার্চিলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য।

আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী চি এবং প্রাক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শগত ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য

ঘটে তার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৬০এর দশকের গোড়ায় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভাজন ঘটে—সি.পি.আই এবং সি.পি.এম. দুটি দলের সৃষ্টি হয়। পরে এই দুই কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সি.পি.আই.(এম.এল) বা নকশালপন্থী বামপন্থী দল গড়ে ওঠে। ভারতে স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতে মূলত গোড়ায় কংগ্রেসের শাসন কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে বজায় থাকলেও ১৯৪৭-৫২-র সময় থেকেই দলত্যাগের সূচনা ঘটে। এই ১৯৪৭-৫২ সময়ে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য আদর্শগত কারণে বা গোষ্ঠীগত রাজনীতির ফলে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে।

১৯৪৮ সালে আচার্য নরেন্দ্রদের উত্তরপ্রদেশে বিধানসভায় সমাজতান্ত্রিক সহযোগী সদস্যদের নিয়ে এক যোগে কংগ্রেস ত্যাগ করে, এবং সমাজতান্ত্রিক দলে যোগদান করে। অবশ্য এই সময়ের কোনও কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন ঘটেনি, যদিও ওই দল থেকে পদত্যাগের ঘটনা ঘটলেও অন্য দলগুলি থেকে কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা ঘটেনি।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৭-এর মধ্যে দুধরনের আইনসভা সদস্যগণের মধ্যে দলত্যগ ও নিজ নিজ স্বার্থ অর্জরে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেস থেকে বিরোধী দলগুলিতে এবং একই সঙ্গে বিরোধী দলগুলি থেকে কংগ্রেস যোগদানের ঘটনাও ঘটে। এর ফলে চারটি রাজ্য সরকার যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল তার পতন ঘটে, যেমন ১৯৫২ তে গগ, ১৯৫৪ এ অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৫৬তে কেরলে এবং ৮ বছর বাদে আবার কেরলে সরকরের পতন ঘটে।

১৯৬০ এর দশকে দলত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে কোয়ালিশন রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই দলত্যাগীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ রাজ্যের সরকারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করে। ওই সময় ১৯৬৭তে দলত্যাগের চূড়ান্ত নজির দেখা দেয় যখন হরিয়ানা আইনসভায় সদস্য গয়ালাল (gayalal) এক দিনে তিনবর দলত্যাগ করেন এবং আয়া রাম গয়া রাম এই মনদ ধারণাটি প্রচারের স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৬৭ এর পর যখন অবিভক্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিবাদ বিরোধ ও প্রতিযোগিত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন আইনসভার সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং এর মধ্যে বেশির ভাগ আইনসভার কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও কেউ কেউ সদস্য কংগ্রেসে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য যোগও দেন। এই সময়ে উল্লেখ্যযোগ্য দলত্যাগের ঘটনা উত্তবপ্রদেশে যেখানে চরণ সিং উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস বিধানসভার ১৬জন সদস্য নিয়ে দলত্যাগ করেন এবং বিরোধী দলগুলির সহায়তায় নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার গঠন করেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হন। অনুরূপ সরকারের পরিবর্তনের ঘটনা হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারে ঘটে। যেসব আইনসভার সদস্য ওই সময় দলত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যে ৮জন মুখ্যমন্ত্রী হন, ১০টি রাজ্যে ওই সময়ে ৩৮টি রাজ্য সরকারের পতন ঘটেছিল এবং এর ফলে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় যে অচলাবস্থা দেখা দেয় তার ফলে রাষ্ট্রপতি শাসন ওইসব রাজ্যগুলিতে প্রবর্তন করা হয়।

একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭-এর মধ্যে দলত্যাগের যেসব ঘটনা ঘটে তাতে কংগ্রেস (আই) দল হিসেবে একই বেশি সুবিধা ভোগ করে। কংগ্রেস ৯৮টি আইনসভার সদসকে হারায়, কিন্তু আইনসভার অন্যান্যদলের ৪১৯জন সদস্যের সমর্থন কংগ্রেস (আই) লাভ করে। আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যরা যারা দলত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস (আই)তে যোগ দেয়নি তারা নতুন দল গঠন করে এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যতে কোয়ালিশন সরকার গঠি হলে তারা ওই কোয়ালিশন সরকারে সামিল হবে।

১৯৬৭ এর পর অবিভক্ত কংগ্রেস দলের মধ্যে যে ভাঙন দেখা দেয়, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল থেকে বেশ কিছু নেতা ও আইনসভার সদস্য পদত্যগ করে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করে এবং অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হন।

আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭-র নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রায় ৩৫০০ জন সদস্য বিধানসভায় যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জন সদস্য পরবর্তীকালে তাদের নিজ নিজ দল পরিত্যাগ করেন এবং কিছু কিছু রাজনীতিবিদ একাধিক বার দলত্যাগ করেন। রাজনৈতিক দলত্যাগের প্রবণতাকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্য ১৯৬৭-র লোকসভার চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্কালে ওয়াই. বি. চ্যবন (Y. B. Chavan)কে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

এই কমিটি ১৯৬৮তে একটি রিপোর্ট পেশ করে যার ফলে পার্লামেন্টে একটি দলত্যাগ বিরোধী বিল পেশ করার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। যদিও বিরোধীপক্ষ এই বিলটি সমর্থন করতে অগ্রনী হয়, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী যিতি তখন নেতৃত্বে ছিলেন তিনি বিষয়টি একটি যৌথ কমিটির কাছে পেশ করেন। তবে অন্যান্য আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে বাতিল হওয়ার আগে এই কমিটির রিপোর্ট থেকে প্রস্তাব আসে নি।

১৯৭২-৭৭ সময়ে ১০টি রাজ্য সরকারকে অপসারিত হতে হয় কারণ আইনসভার সদস্যরা তাদের ভোটগুলি প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক বাজারে বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিল। বস্তুত রাজ্য সরকারগুলির অস্থিতিশীলতা ১৯৭৭-৮০-র মধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাতে ১১টি রাজ্য সরকরের পতন ঘটে, যেহেতু এ. জি. ন্যুরানীর (A.G. Noorani) মতে রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির (Political postituts) উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, এ. জি. ন্যুরানীর (A. G. Noorani) এই অশালীন মন্তব্যের অর্থ হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনসভার সদস্যগণ নিজেদের আর্থিক লোভ ও স্বার্থকে মদত দেওয়ার জন্য যে কোনও রকম অন্যয় পথ গ্রহণ করেছিল।

ডঃ সুভাষ কাশ্যপের মতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে ২০০ জন দলত্যাগী (defection) কে মন্ত্রীত্বের পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং ১৫জন দলত্যাগীকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। এই রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির (political prostitutes) র ভীতি বা অশালীন দুর্নীতি চালু থাকে, যদিও তা শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ, কংগ্রেস ও জনতা দলের (১৯৭৯) দৃষ্টি এড়ায় নি।

১৯৭৭-৭৯ সময়টি হল ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যখন প্রথম জাতীয় স্তরে অ-কংগ্রেসী সরকার বা মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল তা ক্ষমতাচ্যুত হয় যেহেতু ৭৬ জন পার্লামেন্টের সদস্য দলত্যাগ করেছিল। এই ঘটনা ১৯৭৯ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তা সৃষ্টি করে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০তে সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় আসীন হন।

সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে উপক্রম হয় যখন ১৯৮০-র ফেব্রুয়ারি হরিয়ানাতে জনতা সরকার হঠাৎ নিজেকে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস (আই) সরকারের রূপান্তরিত হয়। যদিও জনগণ তাদের প্রতিবাদে সোচ্চার হয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্কৃতিদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের কথা বলে বাস্তবে কিন্তু কিছুই করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৭০-৮০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার যখন কেন্দ্রে আসীন হয়েছে তখন আঞ্চলিক সরকারগুলির পতন ঘটেছে। কারণ অ-কংগ্রেসী জনপ্রতিনিধিরা দলত্যাগ করে আঞ্চলিক সরকারের পতন ঘটিয়েছে। তদানুন্তন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল এই ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে gold rush মন্তব্য করেছিলেন।

যদিও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ও নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি কম বেশি বিশ্ব কেন্দ্রীক, তথাপি বলা হয় যে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (আই) শাসনের সময়ে দলত্যগজনিত ক্ষতিকর রাজনীতি (disruptive politics) ভারতে ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৬৭ এবং ১৯৭১-র মধ্যে পার্লমেন্টের সাধারণ নির্বাচনে যে চার হাজার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তার ৫০% দলত্যাগ করেছিলেন, যা দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছিল।

১৯৮৪তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজ নিরপত্তারক্ষীর হাতে আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তার জ্যেঠপুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন এবং ১৯৮৪-র নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পার্লামেন্টের দলীয় নেতা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন গ্রহণ করেন।

এই সময় রাজনৈতিক দলত্যাগের অনৈতিকতা বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পার্লামেন্টের দলত্যগ বিরোধী বিল পেশ করেন। পার্লামেন্টে দীর্ঘ বিতর্কের পর লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়কক্ষেই সর্বসম্মতভাবে যথাক্রমে ৩০শে জানুয়ারি , ১৯৮৫তে লোকসভায় এবং ৩১শে জানুয়ারি ১৯৮৫তে রাজ্যসভায় দলত্যাগ বিরোধী বিল ৫২তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসেবে পাশ হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫তে রাষ্ট্রপতি সম্মতি লাভের পর, ১৯৮৫-র ১৮ই মার্চ দলত্যাগ বিরোধী আই্ কার্যকরি হয়।

৪.৪ দলত্যাগ বিরোধী আইন

৪.৪.১ ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিষয়বস্তু

১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধন মারফৎ ভারতের সংবিধানে দশম তালিকা (Schedule) সংযোজ করা হয় এবং দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ ও কার্যকরি হয়। [(Anti defection law) ১৯৮৫-র ১৮ই মার্চ)]

এই দলত্যাগ বিরোধী আইনে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে এবং রাজ্যের বিধান পরিষদ এবং বিধানসভায় কোনও নির্বাচিত সদস্য যদি দলত্যাগ করেন তাহলে সেই পদত্যাগের আইনসভার সদস্যপদ নিম্নোক্তি কারণে বাতিল হবে বলে দশম তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

(১) পার্লামেন্টের বা রাজ্য আইনসভার কোনও সদস্য যদি কোন দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছেন অথবা একজন সদস্য যিনি পার্লামেন্টে বা রাজ্য বিধানসভায় কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন, তিনি দলত্যাগের কারণে আইনসভার সদস্যপদ হারাবেন এই কারণে —(ক) যদি সেই সদস্য স্বদিচ্ছায় তার দলের সদস্যপদ ত্যাগকরেন অথবা (খ) যদি তিনি তার দলের নির্দেশ অমান্যকরে বিপরীতভাবে কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে ভোট দিয়েছেন অথবা তিনি ভোট দান থেকে বিরত হয়েছেন।

(২) পার্লামেন্টের বা কোনও রাজ্য আইনসভার একজন নির্দল সদস্য যদি তার নির্বাচিত হওয়ার পর অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

(৩) পার্লামেন্টের বা কোনও রাজ্য আইনসভার একজন মনোনীত সদস্য যিনি মনোয়নের সময় কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, তিনি ওই পদ থেকে বিচ্যুত হবেন যদি তিনি যে তারিখে আইনসভার সদস্য বা তা থেকে ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে একটি রাজনৈতিক দলে যোগ দেন।

(৪) একজন আইনসভার সদস্য আইন ভঙ্গকারী বলে গন্য হবেন না যদি তিনি দাবি করেন যে তিনি যে দল থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই দলে ভাঙন বা বিভাজন ঘটেছে এবং তিনি এবং আইনসভার ওই দলের অন্যান্য সদস্যদের একটি অংশ পদত্যাগ করে একটি নতুন গোষ্ঠী গঠন করেছে এবং যা অন্তত পক্ষে আইনসত্তার আগের মূল রাজনৈতিক দলের অন্তত ১/৩ অংশ হবে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে দশম সাধারণ নির্বাচনে পর লোকসভায় সমাজতান্ত্রিক দলের অজিত সিং (চরণ সিং এর পুত্র) লোকসভায় ওই দলের মোট সদস্য ২১ জনের ১/৩ অংশ অর্থাৎ ৭ জন নিয়ে দলত্যাগ করেন এবং

কংগ্রেসের নরসিংহম রাও সরকারের যোগ দেন এবং এরা বিভিন্ন বিভাগে মন্ত্রীর পদেও আসীন হন। যেহেতু মোট ২১ জন সদস্যের ১/৩ অংশ নিয়ে কক্ষত্যাগ করা হয় তাই এটিকে দলত্যাগ বিরোধী আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য করা হয় না।

(৫) আইনসভার নির্বাচিত কোনও দলের সদস্যকে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ফেলা যায় না যদি তার মূল দল অন্যদলের সঙ্গে মিলিত ও একত্রিত হয়েছে এবং ওই সদস্য ওই নতুন সংগঠিত দলের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে অথবা নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে গঠিত ওই নতুন দল ওই সব সদস্যগণ যোগদান করেছেন।

(৬) লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার স্পীকার অথবা রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন অথবা বিধান পরিষদের চেয়ারপার্সন অথবা ডেপুটি চেয়ারপার্সন নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাকে বেনিয়ম বলা যাবে না, বা পদ শূন্য হবে না, (প্যারাগ্রাফ-৫)

আইনসভার চেয়ারম্যান অথবা স্পীকারকে নিজ নিজ আইনসভার কোনও সদস্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে (প্যারাগ্রাফ-৬)

(৭) কক্ষের (House) কোনও সদস্যের অযোগ্যতা এবং বেনিয়মের বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না (প্যারাগ্রাফ-৭)। তবে ৩২নং, ২২৬নং, ১৩৭নং অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে আদালতকে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করা যাবে না।

(৮) একটি কক্ষের চেয়ারম্যন বা স্পীকার তালিকার নিয়ম অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে প্রয়োগ করবে। এই নিয়মগুলি কক্ষের (House) সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রয়োজন সংশোধন করা বা বাতিল করার অধিকার আছে।

(৯) কক্ষের কোন সদস্যের অপসারণ সংক্রান্ত কোনও সদস্যের অযোগ্যতার বিষয়টি ১২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্লামেন্টের আলোচনার যেমন বিষয়বস্তু হয়, তেমনি ২১২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা রাজ্য বিধানসভার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল—i) রাজনৈতিক দুর্নীতিকে প্রতিহত করা এবং এটি হবে প্রথম পদক্ষেপ যার দ্বারা দেশে অন্যান্য দুর্নীতিকে মোকাবিলা করা যাবে প্রাক্তন সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার ইউ. সি. আগরওয়াল বলেছেন রাজনৈতিক এলাকাকে দুর্নীতিমুক্ত করার মাধ্যমে অন্যান্যদের ও নিম্নস্তরের মানুষদের দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে প্রণোদিত করা সম্ভব হবে। ii) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভভ হবে, সরকারের আইনগত প্রকল্পগুলি যাতে দলত্যাগী আইনসভার সদস্যের দ্বারা ব্যাহত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা সম্ভব হবে। iii) পার্লামেন্টের সদস্যদের আরও দায়িত্বশীল করা যাবে এবং নির্বাচনের সময় যে দলগুলির প্রতি দলের সদস্যদের আনুগত্য ছিল তাদেরও দায়বদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করা যাবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে দলের প্রতি আনুগত্য নির্বাচনের সফল করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৪.৪.২ ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের মূল্যায়ন

১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিশ্লেষণে কিছু কিছু আইনসভার সদস্য এবং রাজনৈতিক দলগুলি এই আইনের কিছু কিছু ফাঁক ফোকর গুলিকে কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ ও উদ্দেশ্যকে যে ব্যাহত করতে পরে সেদিকেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কতকগুলি যুক্তিও এই ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে—

যখন দলত্যাগ বিরোধী বিল সর্বসম্মতভাবে পার্লামেন্টে পাশ হয় তখন এটা ঐতিহাসিক বলে গণ্য করা হয় এবং এটি দেশে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু

এই আইনের দ্বারা অসাধু আইনসভার সদস্যদের প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক বাজারে অসাধু দেওয়া নেওয়র প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়।

তবে এই দলত্যাগ বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে যে শুভধারণা ও আশা করা হয়েছিল তা এই আইনে পাশের পরবর্তীবছরগুলিতে ব্যাহত হয়। মধু লিমায়ে সমালোচনা করে বলেছিলেন যে এই আইনের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার ফলে আয়া রাম গয়া রাম-এর মতো আইনসভার নির্বাচিত সদস্যরা যে আর্থিকলোভ ও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য আইনের ফাঁক ফোকরকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয় যাতে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভদিকগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের যে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলি তা উল্লেখ্য—

প্রথম : দলত্যাগ বিরোধী আইনে এক ধরনের দলত্যাগকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেমন আইনসভায় কোনও রাজনৈতিক দলের যে মোট সদস্য রয়েছে তার ১/৩ অংশ যদি বেরিয়ে আসে তাহলে তাকে দলত্যাগ বলে গণ্য করা হবে না।

আইনের এই ত্রুটির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর্থিক ও অসাধু ক্ষমতা অর্জনের প্রবণতা দেখা দেয়। দশম সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় আইনসভার লোকসভায় বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দলের ২১জন নির্বাচিত সদস্যদের ১/৩ অংশ অর্থাৎ ৭জন সদস্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দলের লোকসভা সদস্য নেতা অজিত সিং দলত্যাগ করে আইনগতভাবে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রী নরসিংহম রাও সরকারের যোগ দেন এবং এই সমাজতান্ত্রিক দলত্যাগী সদস্যগণ নরসিংহম সরকারের বিভিন্ন পদে মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন, এইভাবে যে ভোটারগণ বা নির্বাচকমন্ডলী সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন তাদের অসম্মান করা হয় যা গণতন্ত্রের প্রতি অবমাননা বলে মন্তব্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত : দলত্যাগী বিরোধী আইনের আর একটি দিকের সমালোচনা করা হয় যেখানে দলত্যাগের পর বিষয়টির ক্ষেত্রে স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকার সমালোচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই স্পীকার নির্বাচিত হন এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তার অবাঞ্ছিত পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

১৯৯১ সালে জনতা দল (এস)কে অভিযুক্ত করা হয় যে দলত্যাগ বিরোধী আইনে অভিযুক্ত সদস্যদের মন্ত্রীত্ব পদে রেখেই দেওয়া হয় এবং স্পীকারের সমর্থনও এক্ষেত্রে দেখা যায়, পরে আইনসভার সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যরা রাষ্ট্রপতির কাছে এর বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দেন এবং ওইসব মন্ত্রীদের অপসারণের আবেদন জানায়। পরিশেষে স্পীকারের এবং আইনসভার মর্যাদাকে বাঁচানোর তাগিদে প্রধানমন্ত্রী দলত্যাগী সদস্যদের মন্ত্রীত্বের পদ থেকে অপসারণ করেন।

কিছু কিছু আইনজ্ঞ ওই সময় পরামর্শ দেন যে স্পীকারের অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত থেকে আইনসভার সদস্যদের আইনগত রক্ষার বিষয়টি বিবেচিত হওয়া উচিত। তারা আরও প্রস্তাব দেন যে দলত্যাগের কারণে কোনও সদস্যের অপসারণের বিষয়টিও ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয় এবং সুপারিশ করেন যে দলত্যাগীদের এবং স্পীকারের ভূমিকা যেন একটি বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালের দ্বারা পর্যালোচিত হয়।

তৃতীয়ত : দলত্যাগ (defection) এবং দলের বিভাজন (split) এই দুটি ধারণার ক্ষেত্রে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন দলের বিভাজন (split) কে অবশ্যই মূলদলের ক্ষেত্রে ঘটতে হবে। বলা হয়েছে যে, আইনসভায় দলের মধ্যে যদি শুধু বিভাজন (split) ঘটে তাহলে তা কার্যকর হবে না। এর আগে যে মূল দলের সে সদস্য সেই মূল দলের বিভাজন ঘটতে হবে।

চতুর্থত : দলত্যাগ বিরোধী আইন (১৯৮৫) মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এই আইনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার সুযোগ থাকবে না। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের স্বাধীন সমালোচনার অধিকার থাকবে না। আইনসভার

সদস্যরা দলীয় নির্দেশ মাফিক আইনসভায় ভোট দিতে বা না দিতে বাধ্য থাকবেন। এই পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জসপূর্ণ নয়।

পঞ্চমত : দলত্যাগ বিরোধী আইনের দ্বারা দেশের রাজনীতি কলুষিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় গণতান্ত্রিক। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই সরকার গঠন করেন। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের কোনও সদস্য সরকারের কোনও দুর্নীতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহ হলেও তার করার কিছু থাকে না। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবনতি ঘটে, রাজনীতি ও প্রশাসন কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠত : ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী কোনও দলের আইনসভার মোট সদস্যের যদি এক তৃতীয়াংশ সদস্য দল ছাড়েন তাহলে তা দলত্যাগ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এবং এর ফলে তার জন্য শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বর্তমান আইনে নাই। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারি কাঠামোতে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হতে পারে। এভাবেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং চন্দ্রশেখর মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়।

১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের পর বিভিন্ন সময়ে এই দাবি বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণী থেকে উত্থাপিত হয় যে এই দলত্যাগ বিরোধী আইন (১৯৮৫) পাশ হলেও তা আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি।

নির্বাচনী সংস্কার কমিটি (Committee on Electoral Reforms) যা দীনেশ গোস্বামী কমিটি নামে পরিচিত সেই কমিটি মে, ১৯৯০তে এবং ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া (Law Commission of India) তার ১৭০তম রিপোর্টে (Reforms of Electoral Laws ১৯০৯) এবং ন্যাশনাল কমিশন টু রিভিয়ু) দি ওয়ার্কিং অফ দি কনস্টিটিউশন (National Commission of Review the working of constitution) বা সংবিধানের কাজে মূল্যায়নের যে জাতীয় কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন তার ৩১শে মার্চ, ২০০২-তে সুপারিশ করে যে সংবিধানের দশম তালিকার Tenth Schedule) ৩নং প্যারাগ্রাফে বিভাজন (split) বা দলের বিভাজনের ফলে দলত্যাগকে দলত্যাগ বলে গণ্য করা থেকে বিরত থাকার যে সুপারিশ করা হয়েছে তাকে বাতিল করার সুপারিশ করে, অর্থাৎ দলের মধ্যে বিভাজন (split) জনিত দলত্যাগকেও দলত্যাগ হিসেবে একইভাবে দেখতে হবে। এন সি আর ডব্লিউ সি (NCRWC) আরও মতামত প্রকাশ করে যে একজন দলত্যাগীকে মন্ত্রী হিসেবে বা সরকারিপদে বা অন্য কোনও আর্থিক পদে আইনসভায় বাকি সময়ে অথবা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত কোনও সরকারি পদে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

NCRWC (National Commission of Review the working of the constitution) আরও সুপারিশ করে যে সরকার যাতে বড় আকারের মন্ত্রীসভা কেন্দ্রে অথবা রাজ্য সরকারে গঠন করতে বিরত হয় সেই উদ্দেশ্যে লোকসভা , বিধানসভার মোট সদস্যের ১০% এর বেশি সদস্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে না। তবে মন্ত্রীসভার আয়তন কেন্দ্রে লোকসভায় মোট সদস্যের এবং রাজ্যে বিধানসভার মোট সদস্যের ১০% এর বেশি না হওয়ার সুপারিশ NCRWC করলেও, ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যেরূপ সিকিম, মিজোরাম, এবং গোয়াতে যেখানে রাজ্য আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভায় যথাক্রমে ৩২, ৪০ এবং ৪০ জন সদস্য থাকার জন্য ওই রাজ্যগুলিতে মন্ত্রীসভার ন্যূনতম সদস্য ৭ জন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

পরবর্তী সংবিধান সংশোধন বিলে এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

৪.৪.৩ দলত্যাগ বিরোধ সংক্রান্ত ৯১তম সংবিধান সংশোধন আইন, ২০০৩

১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনের পর বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে ৯১তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী—দলত্যাগ বিরোধী আইন রচিত হয়। (**১নং অনুচ্ছেদ, ২নং অনুচ্ছে**) এই সংশোধনীতে ৭৫নং অনুচ্ছেদের ২নং ধারার পরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যুক্ত হয়—

১(এ) প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের সংখ্যা লোকসভার মোট সদস্যের ১৫% এর বেশি হবে না।

১(বি) পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও এক সদস্য যার দশম তালিকার ২নং প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী সদস্যপদ বাতিল করা হয়, তিনি যে তারিখ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন সেই তারিখ থেকে যে সময় তার সদস্যপদ শেষ হত ওই সময়ের মধ্যে তাকে কোনও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা যাবেনা। অথবা তিনি যদি পরে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন বলে ঘোষণা করা হয় সেই তারিখ পর্যন্ত তাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা যাবে না।

৩নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে সংবিধানের ১৬৪নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারার পরে নিম্নলিখিত ধারাগুলি যুক্ত হবে, যথা—

১(এ) কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার মোট সংখ্যা ওই রাজ্যের সভার মোট সদস্য সংখ্যার ১৫% এর বেশি হবে না— তবে কোনও রাজ্যে মুখমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা ১২-র কম হবে না। যদি কোনও রাজ্যে এই ৯১তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার মোট সদস্য সংখ্যা বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ১৫% এর বেশি হয়, তাহলে ৬ মাসের মধ্যে ওই সংখ্যা সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী হ্রাস করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি সরকারি নোটিশ দিয়ে তা করবেন

১(বি) কোন রাজ্যের বিধানসভার সদস্য অথবা কোনও রাজ্য যেখানে উচ্চকক্ষ বিধানপরিষদ রয়েছে সেখানে যে কোনও কক্ষের সদস্য যিনি দশম তালিকার ২নং প্যারাগ্রফ অনুযায়ী সদস্যপদ বাতিল সেখানে (১) নং ধারা অনুযায়ী তিনি যে তারিখ থেকে অপসারিত হয়েছেন সেই তারিখ থেকে কোনও মন্ত্রীপদে আসীন হতে পারবেন না; বা যে সদস্য বিধানসভা বা বিধানপরিষদ থেকে যে তারিখে অপসারিত হয়েছেন সেই অপসারিত সদস্য পরে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন যে তারিখে সেই তারিখ থেকেই ওই সদস্যের কার্যকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়া যাবে না—এই দুই বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সদস্য দলত্যাগের জন্য অপসারিত হয়েছিলেন এক্ষেত্রে যে তারিখটি আগে হবে। সেখানে তা মন্ত্রী না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে সংবিধানের ৩৬১(এ)-র পর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করতে হবে যথা— ৩৬১ বি অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে কোনও আইনসভার কোনও কক্ষের কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য যিনি অযোগ্যতার কারণে ওই কক্ষের সদস্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তিনি কোনও বেতনভিত্তিক রাজনৈতিক পদে যুক্ত হতে পারবেন না এবং এই নিষেধাজ্ঞা ওই আইনসভার বাকি কার্যকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে অথবা ওই আইনসভা থেকে বহিষ্কৃত সদস্য যদি উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন, তাহলে নির্বাচিত হওয়ার সেই তারিখ পর্যন্ত কোনও আর্থিকদিক থেকে রাজনৈতিক পদে যোগদানের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

প্রসঙ্গত (i) আর্থিকভাবে রাজনৈতিক পদটি (remunerative political) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হবে, অথবা (ii) একটি সংস্থা যা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং বেতন বা পারিশ্রমিক ওই সংস্থাকে প্রদান করে। আবার অনেক সময় কোনও সংস্থাকে অর্থ প্রদান করা হয় বা পরিশোধ সাপেক্ষ (compensation)

৫নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের দশম তালিকার (Schedule) (ক) ১নং প্যারাগ্রাফের বি উপধারা (clause) প্যারাগ্রাফ ৩নং এর শব্দগুলি এবং সংখ্যা (figuses)গুলি বাতিল করার কথা বলা হয়েছে (খ) ২নং প্যারাগ্রাফে উপ প্যারাগ্রাফ (১)এ শব্দগুলি এক সংখ্যাগুলি প্যারাগ্রাফ চার এবং পাঁচে শব্দগুলি এবং সংখ্যাগুলি পরিবর্তিত হবে (substituted) (গ) প্যারাগ্রাফ (৩) বাতিল হবে।

১৯৮৫ ও ২০০৩ সালের দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিশ্লেষণের পর পরিশেষে বর্তমান অবস্থার ভারতের গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় নির্বাচনের স্বরূপ এবং বাস্তবদিকগুলি বিবেচ্য বস্তুতপক্ষে এই দলত্যাগ বিরোধী দুটি আইনস পাশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ নির্বাচন এবং নির্বাচিত সদস্যদের ভূমিকা আশানুরূপ হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামতগুলি উল্লেখ্য—

(১) এডমন্ড বার্ক (Edmand Burke) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে (Representative Democracy) র উপর যে বিখ্যাত ভাষণ দেন তা হল প্রতিনিধিকে চিন্তা করা উচিত দেশের পক্ষে কোনটি ভালো এবং শুধুমাত্র তার নির্বাচনী এলাকার (constitutency) জন্য নয়।

(২) দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফলে ভারতের পার্লামেন্টের ব্যবস্থা বাস্তবে (defacto) রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো রূপান্তরিত হয়েছে এবং শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৩) অপরপক্ষে ডঃ আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের খসড়া আলোচনায় বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও পার্লামেন্টের শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর দায়িত্বশীলতা ভারতের মতো দেশে কাম্য।

(৪) সুপ্রীম কোর্ট কি হোতো হওল্লোওহান বনাম জাকহিল হু (১৯৯২) (Kihota Hollohan vs Zachil hu (1992) মামলায় দলত্যাগ বিরোধী আইনকে স্বীকৃতি দিলেও ঘোষণা করে যে দলত্যাগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তর বিচার বিভাগীয় মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে।

এই দলত্যাগ বিরোধী আইন (১৯৮৫) দশম তলিকায় section 2(1)(b) তে বলা হয়েছে একজন আইনসভার সদস্য দলত্যাগী বলে পরিগণিত হবে যদি তিনি তার রাজনৈতিক দলের কোনও নির্দেশের বিরুদ্ধে ভোট দেন বা ভোটদান থেকে বিরত হন। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয় যে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে দলের নির্দেশের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা প্রয়োজন যা সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দলের নির্বাচনী প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আইনসভার সদস্যের বাক স্বাধীনতার উপর অবাঞ্ছিত সীমাবদ্ধতা না করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনীশ তেওয়ারীর (Manish Tewari) প্রাইভেট মেম্বার বিলের বিষয়টি উল্লেখ্য—যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে দলত্যাগ বিরোধী আইন অনাস্থা প্রস্তাব এবং অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয়ে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর ফলে সরকারের স্থিতিশলীতার দিকটি যেমন বিবেচিত হবে তেমনি দলের হুইপের বা নির্দেশের মধ্যেও পার্লামেন্টের সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোটাধিকারের সুযোগও থাকবে।

(৫) প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ী ২০০৩ সালে দলত্যাগ বিরোধী সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টের পেশ করেন। প্রণব মুখার্জি নেতৃত্বে একটি কমিটি বিলটি পরীক্ষা করে। এই কমিটি মন্তব্য করে দলের বিভাজন (split) বিষয়টি ভুল ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর ফলে দলত্যাগের গলদগুলি যথার্থ গুরুত্ব সহকরে প্রতিহত করা যায় নি। উপরন্ত টাকার লোভ ও লাভের জন্য অফিসের পদ দখল মন্ত্রীত্ব লাভের লোভ এব টাকা পয়সা লেনদেনের চাপে এই দলত্যাগের ব্যপক প্রবণতা দেখা দেয় এছাড়া ১/৩ অংশ দলীয় সদস্য নিয়ে দলত্যাগ করলে তা দলত্যাগ হবে না এই সংশোধন যা ১৯৮৫-র দলত্যাগ বিরোধী আইনে সংবিধান সংশোধন (৫২তম) যুক্ত করা হয়েছিল তা ২০০৩ সালের দলত্যাগ বিরোধী সংবিধান সংশোধন আইনে (৯১তম) বাতিল করা হয়।

১৯৮৫ ও ২০০৩ দলত্যাগ বিরোধী আইন সত্ত্বেও ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অন্যায় দুর্নীতিমূলক বিভিন্ন কাজ নির্বাচনের সময় এবং পরবর্তী সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে ব্যাহত করতে হবে। এই ব্যাপারে কতকগুলি সুপারিশ উল্লেখ্য।

প্রথমত : একজন আইনসভার সদস্য কোনও দলের পক্ষে নির্বাচিত হওয়ার পর সেই দলের অবস্থিত কাজ কর্মকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমালোচনা করতেই পারেন এবং তাকে যদি দল থেকে ওই রাজনৈতিক দল বহিষ্কার করে এবং ওই সদস্য যদি সদস্যপদে আসীন থাকতে চান, সেক্ষেত্রে ওই সদস্যের আইনসভার সদস্যপদ বাতিল হয় উচিত নয়।

প্রসঙ্গত : গণতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ দেশে কোনও সদস্য দলত্যাগ করলেও আইনসভার সদস্যপদ আসীন থাকেন। গ্রেটব্রিটেনে ১৯৩১ সালে প্রথম শ্রমিক দলের (labour party) প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald দলের সঙ্গে মতান্তর ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে ভিন্নমত অনুসরণের মাধ্যমে দলত্যাগ করেন, কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড ও অপর তিনজন ক্যাবিনেট সদস্য যারা দলত্যাগ করেছিলেন তারা কেউই কমন্সসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন নি এবং নতুন করে ভোটের সম্মুখীন হননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেসের সদস্যগণ ও নিজদলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে দলত্যাগ না করেও বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে এবং আইনসভার সদস্যপদও বজায় রয়েছে। ভারতেরও রাজনৈতিক দলের আইনসভার সদস্য প্রয়োজনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেই পারেন এবং ভোটের ক্ষেত্রেও নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করতে পারেন; তবে এতে দলের সদস্যপদ বাতিল হবে না; এতে নির্বাচনের ঝামেলা, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে টাকা পয়সার যে অন্যায় লেনদেন ঘটে তার সুযোগ বন্ধ হবে এবং নির্বাচন পরিচালনার যে ব্যয় হয় তা এড়ানে যাবে।

অবশ্য কোনও সদস্য যদি নিজ থেকে পদত্যাগ করেন তা স্বতন্ত্র বিষয় তবে এই শূন্য আসনে দ্রুত উপনির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : দলত্যাগ সংক্রান্ত প্রশ্নে বা আইনসভার কোনও সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্পীকার বা চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যেহেতু এই দুই পদাধিকারীর পদপূরণের ক্ষেত্রে সরকারি দলেরই প্রভাব স্বাভাবিক তাই শাসক দলের প্রতি অবাঞ্ছিত পক্ষপতিত্ব বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই স্পীকার বা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের কাছে বিষয়টি উত্থাপনের সুযোগ থাকা দরকার।

তৃতীয়ত : বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রে নির্বাচিত সদস্যের দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনভাবে আইনসভায় ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকা দরকার। আসন হারাবার শঙ্কা না থাকলে। সেই সদস্য নিজের মত, অনুযায়ী ভোট দিতে পারবেন। এরপরে পরবর্তী নির্বাচনে বা রাজনীতিতে ভোটাররা সেই প্রার্থীকে ভোট দিতে বা সমর্থন করতে আগ্রহী হবেন যিনি দলীয় সদস্য হলেও স্থানীয় স্বার্থগুলিকে ভালোভাবে দেখবেন। এর সুফল হল রাজনৈতিক দলগুলি সেই সমস্ত প্রার্থীকে নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী করবে উৎসাহিত হবে যাদের শুধু দলীয় নেতাদের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে সাধারণ মানুষের এবং দেশের স্বার্থের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে।

পরিশেষে ভারতে যে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা, বহু দলীয় নীতিকে সংবিধানিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে বাস্তবে সফল ও ফলপ্রসূ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি তা তাদের সদস্যদের আন্তরিকভাবে সক্রিয় হতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্বেকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দলের আইনসভার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের সুযোগ এবং দল তাকে বহিষ্কার করলেও তার আইনসভার সদস্যপদ বাতিল হবে না। অবশ্য যদি সদস্য নিজ থেকেই আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করতে চায়, সেই সুযোগও অধিকার তার থাকবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ওই শূন্য আসনের নির্বাচন করতে হবে।

আইনসভায় কোনও সদস্যের অংসবিধানিক বা অশালীন আচরণের জন্য স্পীকার বা চেয়ারম্যানের অধিকার থাকবে সেই সদস্যকে তিরস্কার করা, প্রয়োজনে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া, তবে স্পীকার বা চেয়ারম্যানের এই নির্দেশ তার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ সদস্যদের থাকবে। নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনও স্তরেই অসাধু উপায়কে বরদাস্ত করা হবে না।

৪.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(ক) রাজনৈতিক দলত্যাগ বলতে কি বোঝায়?

(খ) ১৯৮৫ সালের দলত্যাগ বিরোধী আইনের পর্যালোচনা করুন।

৪.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Gehlot, N. S. (1991). The Anti-Defection Act, 1985 and the Role of the Speaker. *The Indian Journal of Political Science , 52* (3), 327-340.

ii. Kamath, P. M. (1985). Politics of Defection in India in the 1980's. *Asian Survey , 25* (10), 1039-1054.

iii. Kashyap, Subhash C. (1993). *Anti-Defection Law and Parliamentary Privileges*. Bombay: N. P. Tripathi Pvt. Ltd.

iv. Kashyap, Subhash C. (1970). The Politics of Defection: The Changing Contours of the Political Power Structure in State Politics in India. *Asian Survey , 10* (3), 195-208.

v. Kumar, Venkatesh. (2003). Anti-Defection Law: Welcome Reforms. *Economic and Political Weekly*. *38* (19).

C.C : 2.2

Unit-5

Judicial Activism and PIL

Contents :

5.1 Objectives

5.2 Judicial Activism in India

5.3 Public Interest Litigation in India – concept, scope and overview of some cases

5.4 Self Assessment Questions

5.5 Suggested Readings

5.1 Objectives

This unit in its first part tries to discuss the origin and implications of judicial activism in India, with special reference to a number of cases. The second part of the unit deals with the phenomenon of Public Interest Litigation and how it has developed over the time.

5.2 Judicial Activism in India

"The anglo-saxon tradition persists in the assertion that a judge does not make law: he emerely interprets. Law is existing and eminent; the judge merely finds it… this judicial view, I'm afraid, hides the truth of the judicial process… it is for the judge to give meaning to what the legislature has said and it is this process of interpretation which constitutes the most creative and thrilling function of a judge… the judge infuses life and blood into the dry skeleton provided by the legislature and creates a living organism appropriate and adequate to meet the needs of the society…" – Justice P.N. Bhagwati

It was for the first time in 1947 that the term 'judicial activism' was coined by the American historian Arthur Schlesinger Junior. In the Indian context, the evolution and development of the doctrine of judicial activism is credited to Justice PN. Bhagwati, Justice V.R. Krishna Iyer, Justice D.A. Desai and Justice O. Chinappa Reddy. It is known that the Indian constitution provides for judicial review under articles 32 (in case of the Supreme Court) and article 226 (in case of High Courts). This process of judicial review empowers the courts to strike down any law which they find 'ultra vires' or unconstitutional. However, courts today are not only restraining themselves to the act of merely striking down a law or preventing something from being done but the courts have taken up a more assertive and affirmative actions, with the issuing of new order and directing remedial actions.

Judicial activism evolved in India in the late 1960's and early 1970's with the Privy purse case. Mrs. Indira Gandhi during her Prime Ministership promoted her concept of 'garibihatao' and in a bid to achieve the objective she abolished the privy purses provided to the erstwhile princes of the princely states in India. Further, 14 major banks were nationalized during her egime to serve the objective of eradicating poverty among the Indian masses. The Judicciary in response struck down the legislation as unconstitutional and thus, in the privy Purse Case (Madhav Rao Jivaji Rao Scindia v Union of India, 1970) the court, by virtue of Article 53 of the Indian constitution, ruled that the President must exercise his executive powers in accordance with law and not with a motive to defile or destroy the constitution. This ruling is considered as a major instance of judicial activism and overreach in India. Two other cases can be regarded as milestones in the evolution and development of the doctrine of judicial activism in India. Firstly, in the case of Golaknath v. State of Punjab (1967), the Supreme Court evolved the concept of 'prospective overruling' and held that Fundamental Rights cannot be infringed upon or amended for the implementation of Directive Principles and under any situation the Parliament has no right to take away or violate the Fundamental Rights, which are 'sacrosanct' in nature. As a reaction to the Golaknath case, the Parliament enacted the 24th Amendment Act (1971) and the 25th Amendment Act 1971 and in the 24th Amendment Act, the Parliament laid down that it possesses the power to abridge or take away any of the Fundamental Rights through a constitutional amendment and inserted a new article 31C with this effect. Consequently, in the Fundamental Rights case or the case of Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) has been a major shift and milestone not only regarding judicial activism but with regard to entire constitutional jurisprudence in India. In this case the Supreme Court declared article 31 C(2) as 'ultra vires' and introduced the doctrine of 'basic structure' to enunciate that "the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the 'basic structure' of the constitution. This means that the Parliament cannot abridge or take away a Fundamental Right that forms a part of the 'basic structure' of the Constitution."(Laxmikanth, 2017) Other prominent cases of Judicial Activism are: R C Cooper v. Union of India (1970), V.C. Shukla v. Delhi Admin (1980), Fertilizer Corporation Kamgar Union v. Union of India (1981), S.P Gupta v. Union of India (1982), etc.

Subhash Kashyap has opined that under certain contexts and grounds the judiciary 'may have to overstep its normal jurisdiction and intervene in areas otherwise falling within the domain of the legislature and the executive: i) When the legislature fails to discharge its responsibilities. ii)In case of a 'hung' legislature when the government it provides is weak, insecure and busy only in the struggle for survival and, therefore, unable to take any decision which displeases any caste, community or other group. iii) Those in power may be afraid of taking honest and hard decisions for fear of losing power and, for that reason, may have public issues referred to courts as issues of law in order to mark time and delay decisions or to pass on the odium of strong decision-making to the courts. iv)Where the legislature and the executive fail to protect the basic rights of citizens, like the right to live a decent life, healthy surroundings, or to provide honest, efficient and just system of laws and administration. v) Where the court of law is misused by a strong authoritarian parliamentary party government for ulterior motives, as was sought to be done during the emergency aberration. vi)Sometimes, the courts themselves knowingly or unknowingly become victims of human, all too human, weaknesses of craze for populism, publicity, playing to the media and hogging the headlines.' (Laxmikanth, 2017)

Justice P.N. Bhagwati in this elaboration of details on the development and working of Judicial Activism in India. Judicial Activism works in India through several programmes including the following – i) Legal aid movement – "we would take lawyers to the rural areas, invite the people to come with their problems, and the lawyers would advise them, try to solve their difficulties", ii) Lok Adalat – "which are voluntary mediation agencies. These lawyers, retired judges, and social activists would take cases pending in the lower courts and attempt to secure a settlement." Iii) Social-action groups – "we started organizing them, providing them assistance in the shape of funds, the shape of lawyers and under the asupices of my committee they started holding campus for training social activists as paralegals so that they may provide first-aid in law in the rural areas." Iv) "Lastly we developed the strategy of public interest litigation… one major impediment in the way of access to justice for the poor was the doctrine of standing. It requires that only a person to whom a legal wrong is done can seek judicial redress. So in one seminal decision we took the view that where a legal wrong is done to a person or class of persons, who by reason of poverty, disability, socially or economically disadvantaged position, cannot approach a court of law for justice, any member of the public or any social action group can initiate an action in the high court or the Supreme Court for vindicating the rights of the underprivileged… thus developed what was now come to be known as epistolary jurisdiction, jurisdiction which is invoked by writing epistles to a court." (Bhagwati, lecture)

Further, renowned jurist Upendra Baxi has provided an elaborate categorization of social and human rights activists and groups who has greatly activated Judicial Activism and Public Interest Litigation. These include Civil Rights Activists, People's Rights Activists, Consumer Rights Groups, Bonded Labour Groups, Citizens for Environmental Action, Citizen Groups against Large Irrigation Projects, Women's Rights Groups, Child Rights Groups, Custodial Rights Groups, Poverty Rights Groups, Rights of Indigenous People Groups, Bar-Based Groups, Autonomy of Media Groups, Assorted Lawyer-Based Groups and Assorted Individual Petitioners.

5.3 Public Interest Litigation in India—concept, scope and an overview of some cases

As briefed in the previous section, Public Interest Litigation developed in India with the judicial activism role of the Supreme Court and with the relaxation of the rule of locus standi. Thus, now, any person or public-spirited citizen who have 'sufficient interest' can go to the court on behalf of those who are not in positions to file a PIL themselves. In the case of Janata Dal v. H.S. Chowdhary (1992), the Supreme Court defined PIL as "a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or a class of the community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights and liabilities are affected."

The Supreme Court laid down certain guidelines in 1998 which define the scope of Public Interest Litigation to a great extent. As per the guidelines, cases pertaining to the following categories shall be entertained or regarded as PIL cases – i) Bonded Labour Matters, ii) Neglected children, iii) Non-payment of minimum wages to workers and exploitation of casual workers and complaints of violation of Labour Laws

(except in individual cases), iv) petitions from jails complaining of harassment, for pre-mature release and seeking release after having completed 14 years in jail, death in jail, transfer, release on personal bond, speedy trial as a fundamental right, v) petitions against police for refusing to register a case, harassment by police and death in police custody, vi) petitions against atrocities on women, in particular harassment of bride, bride-burning, rape, murder, kidnapping, etc, vii) petitions complaining of harassment or torture of villagers by co-villagers or by police from persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and economically backward classes, viii) petitions pertaining to environmental pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food adulteration, maintenance of heritage and culture, antiques, forest and wild life and other matters of public importance, ix) petitions from riot-victims, x) family pension, etc. Further, the Supreme Court laid down that the following cases shall not be recognized or regarded as PIL cases – i) landlord-tenant matters, ii) service matter and those pertaining to pension and gratuity, iii) complaints against Central/State government departments and Local Bodies except those relating to item numbers 1-10 above, iv) admission to medical and other educational institutions and v) petitions for early hearing of cases pending in High Courts and Subordinate Courts. (Laxmikanth, 2017)

The foundation of the concept of Public Interest Litigation was laid in India in 1976 with the case of Mumbai Kamgar Sabha v. Abdul Thai (AIR 1976) and was initiated in the case of Akhil BharatiyaShoshitKarmachari Sangh (Railway) v. Union of India (AIR 1981). However,the first known case of PIL in India was that of *Hussainara Khatoon vs. State of Bihar (1979)*and the first Indian lawyer to file a PIL was was Mrs. KPushpa Kapila Hingorani. which highlighted the deplorable inhuman conditions of the prisoners and under trial prisoners. The prisoners were languishing in jails for a timeframe much longer than the maximum punishment sentenced to. Right to speedy justice thus emerged as a fundamental right after this case and more than 40,000 prisoners were released subsequently.

The Right to life has received widespread and dynamic interpretation through PIL cases. For instance in the case of Mohd. Haroon v. Union of India (2013), 'the PIL related to the communal violence in Muzzafarnagar and neighbouring areas and highlighted the deteriorating condition of victims of these riots. The Supreme Court directed the State of U.P., in association with the Central Government, to take immediate charge of all persons who are stranded without food and water, and to set up relief camps providing all required assistance.' (Hingorani) Other significant PIL cases with regard to the Right to Life are Ajay Bansal v. Union of India (2013), Harshad J. Pabari v. State of Gujarat (2013), and so on. With regard to rights of children some significant cases are People's Union for Democratic Rights v. Union of India (1984), M. C. Mehta v. State of Tamil Nadu (1992), BachpanBachaoAndolan v. Union of India (2013), and so on.

A PIL case pertaining to the rights of women which created a new milestone in the history of Public Interest Litigation and Judicial activism in India is the case of Laxmi v. Union of India (2013). In this case, 'the PIL highlighted the need for stringent regulations under the Poison Act, 1919 in respect of acid attacks on women. The Supreme Court directed the Home Secretary, Ministry of Home Affairs and the Secretary, Ministry of Chemical and Fertilizers to convene a meeting to discuss the enactment of appropriate provisions for effective regulation of sale of acid in the states/Union Territories; measures for the proper treatment, after care andrehabilitation of the victims of acid attack and needs of acid attack victims, and compensation payable

to acid victims by state or the creation of a separate fund for payment of compensation to the acid attack victims. As immediate relief, the court directed that the acid attack victims shall be paid compensation of Rs 3 lakhs by the concerned state government/ Union Territory as the after care and rehabilitation cost. Out of this amount a sum of Rs 1 lakh was to be paid to such victim within fifteen days of occurrence of such incident (or being brought to the notice of the state government / Union Territory) to facilitate immediate medical attention and expenses in this regard. The balance sum of Rs 2 lakhs was to be paid as expeditiously as may be possible and positively within two months thereafter. The chief secretaries of the states and the administrators of the Union Territories were required by the court to ensure compliance of the above direction.The Supreme Court further held that the states and Union Territories which have not yet framed rules would do well to make rules to regulate sale of acid and other corrosive substances in line with the model rules framed by the Central Government. The states which have framed rules that were, however, not stringent as the model rules framed by the Central Government, would make necessary amendments in their rules to bring them in line with the model rules.' (Hingorani)

5.4 Self Assessment Questions

i. Discuss in details Judicial Activism in India.

ii. Give an account of the evolution and development of Judicial Activism in India with reference to case laws.

iii. What are the various programmes and groups through which Judicial activism works in India?

iv. What is Public Interest Litigation?

v. Discuss the evolution and scope of Public Interest Litigation in India.

vi. Discuss the evolution of Judicial Activism and Public Interest Litigation in India with reference to case laws in India.

vii. Do you think the case of Laxmi vs. Union of India (2013) or the acid attack case is an imporltant landmark in PIL in India? Argue for or against your views.

5.5 Suggested Readings

i. Kashyap, S. C. (1997). Judiciary Legislature Interface. Politics India.

ii. Laxmikanth, M. (2017). Indian Polity (Fifth ed.). Chennai: Mcgraw Hill Education (India) Private Limited.

C.C : 2.2

Unit-6

Indian Bureaucracy : Role and Neutrality

Contents :

6.1 Objectives

6.2 Introduction

6.3 Definition of Bureaucracy

6.4 Features of Bureaucracy

6.5 Historical background behind the evolution of the term Bureaucracy

6.6 Historical background in India

6.7 Challenges to Bureaucracy in 21st Century

6.8 Differences in Bureaucracy between Western countries and India

6.9 Self Assessment Questions

6.10 Suggested Readings

6.1 Objectives

The present unit in its initial sections discuses the basic concept, features and historical evolution of bureaucracy both as a term and as a process in India. In the subsequent sections the unit tries to provide the students with an insight into the challenges faced by bureaucracy in the 21st century, differences in bureaucracy between western countries and India and neutral bureaucracy and its need.

6.2 Introduction

The term Bureaucracy is derived from two Greek words chiefly "Bureau" and "Kratos". The word "Bureau" means the office while "Kratos" refers to power or rule. Hence the word bureaucracy is referring to the power of the office. It is the rule which is conducted from a table or office, which are preparation and dispatch of written documents and electronic one. Terms like Bureaucracy, Civil Servant, Government officials, Permanent Executive and Non Political Executive are used to describe all such persons who carry out the day to day administration. The term Bureaucracy and Civil Servant are popularly used as synonyms. They constitute the permanent and professional part of the executive organ of the government. Often characterized as non-political or politically neutral, permanent and professionally trained Civil Servant. They play a vital role in running the administration of the state according to the policies and laws of the governmental political executives. They work under the leadership and control of the political executives.

In the broad sense, the term bureaucracy can be referred to all the permanent employees of the government right from the peons and clerks to the top level officials. In a narrow sense, it is used to denote the important and higher level of public servant who occupy top level positions in the administration both at the centre and state level.

6.3 Definition of Bureaucracy

According to **Robert Garner**, "Bureaucracy means the civil servants, the administrative functionaries who are professionally trained for the public service and who enjoy permanency of tenure, promotion within service partly by seniority and partly by merit". **Willoughby** states that " In its broad large sense the term Civil Servant is used to describe any personnel system where the employees are classified in a system of administrative composed of a hierarchy, sections, divisions, bureaus, departmental and the like". Finer on other hand define as "Civil Servant/ Bureaucracy is a professional body of officials permanent, paid and skilled".

6.4 Features of Bureaucracy

Bureaucracy has always proved itself to the steel frame behind running the Indian administration. The following are the features which are as follows:

1) **Permanent character**: the Civil Servant holds permanent jobs in various governmental departments. They mostly join their services during their youths and continue to work as government servants till the age of retirement ranging from 58 to 60 years of age.
2) **Hierarchial organisation** : the system of bureaucracy is hierarchically organized into several layers whereby each official is placed at a particular and certain level of hierarchy. He thereby enjoys the privileges and powers which are available to his co-level officials. He is placed under his immediate higher level officials and is above his immediate lower level officials. The principle of rule of the higher over the lower governs the inter-relations between various levels of the bureaucracy.
3) **Non partisan character** : one of the unique feature of a bureaucratic is that they cannot be directly involved into politics. Neither do can they join any political parties or participate into any political movements. They remain unaffected by the political changes which keep on coming into political executive. The bureaucrats remain unaffected, neutral at whichever political party may come into power and make their government. They just carry out their assigned departmental tasks and activities bestowed to them impartially and faithfully.
4) **Professional, Trained and Expert Class**: The Civil Servants are basically the bunch of educated and professionally trained class of person which helps the political executives in carrying out its day to day functions. It is through competitive examinations by which the members of Civil Servants are selected. Needlessly it is to say that they are the best brains seleceted for the service. They also

receive special training and orientation before joining their own post. During the course of their service, they also need to attend various and several Orientation and Refresher courses in order to update themselves with the change of pace. They have the knowledge, training and expertise necessary for carrying out their administrative work.

5) **Fixed salaries** : Each member from the bureaucrats in accordance to their own hierarchy receives a fixed salary at the time of appointment of which he is entitled to. This allotment and pay band of salary depend upon the nature and level of the job responsibilities of which he is entitled to. Each job also ensures different allowances as per the cited rules and regulations.

6) **Bound by rules and regulations**: The bureaucrats always work in compliance with the rules and regulation laid by the constitution of India. They are also required to follow strict obedience to rules and to conduct administration through proper channel. Each official work only within the sphere prescribed for him by the rules of his department.

7) Class consciousness: this is the basic attribute amongst the bureaucrats to be highly class conscious. They always work and stood to promote and protect the interest of their own respective class. Henceforth they are called white-collar class whereby the belief and the faith of being into a "superior status" as the government officials.

8) Public service spirit as the ideal: It is from the post independence era that the bureaucracy have ad can be identified itself with public service spirit. As they are selected from the best of the brain across the country, the sole purpose is to deliver the best of the public service and welfare, satisfaction of public needs. They are expected to be responsible officer of highest order.

9) Bound by a Code of Conduct: as these bureaucrats always have to act in a disciplined way, following rules and regulations and serve the public, they need to follow a specific code of conduct. They cannot act arbitrarily. A clear set of rights, duties and privileges have been chalked out in order to aid them to run the administration. Failing to perform so, they can be punished for their incompetence, misbehavior, negligence or violation of their conduct rules. They are expected to maintain political neutrality, professional competence, permanent and stable tenure, fixed salaries and strict obedience to rules.

6.5 Historical background behind the evolution of the term Bureaucracy

It is in 18th century when the term bureaucracy was first coined by Vincent de Gourney , who was a french economy in 1745. After him, the term was further popularized by several French writers but the British social scientist was yet to use the word. It was only in 19th century that the Britishers started using it with J.S Mill, making a head way start. He was soon followed by Mosca and Michels, who were the two renounced sociologist of their times. But it was Max Weber who made a systematic study of bureaucracy. It was under Weber that the term Bureaucracy got more theoritized than his precedor Karl Marx.

Weber's theory of Bureaucracy: Origin and Definition

According to Karl Marx, the rise of modern state was the outcome of capitalist development. To this, Weber differed. The concept of State and its existence was there and developed even before the development of modern capitalism. It created huge machinery for the management of public and private administration. Before the advent of capitalism, this gargantuan administrative structure did not have any existence. It is considered opinion of Weber and today many share this view of Weber.

To Marx, the system of Bureaucracy was parasitic in nature residing within state. He did not regard it as integral part of the society. Weber in both of these condition, begged to differ. He advocated for a centralized, efficient, and well channeled bureaucracy was not only inevitable but also an integral part of the modern state structure. In his book , Economy and Society :Volume 2, Weber stated that " the growing complexity of the administrative task and the sheer expansion of the scope increasingly result in the technical superiority of those who have had training and experience and will thus inevitably favour the continuity of at least some of the functionaries. Hence, there always exists the probability of the rise of a special, perennial structure for administrative purposes, which of course means for the exercise of rule".

Weber has advocated for three models of bureaucracy which are as follows:

a) **Rational –Administrative model**: this is the first model of bureaucracy. The system of bureaucracy is run by the rational administrative machine and because of this rationality Weber calls it to be an ideal type. Basically, bureaucracy is hierarchical in nature, whereby clear cut demarcation amongst different officials of different ranks and post have been made. Each of them is guided by definite set of rules and regulations with authority of officers are impersonal. They have been recruited on the basis pf open and public examination with regular and periodic up gradation through Refresher and Orientation programmes. Seniority, experience and efficiency are recognized and duly rewarded. These are the reasons why Weber used to consider bureaucracy as an ideal type.

Owing to the status of being rational, the term bureaucracy has earned tremendous popularity during the last one century and every nation, be it large or small, has adopted the bureaucratic mode of administration. Weber repeatedly asserted that the bureaucratic authority /administration is far more superior from that of the traditional or charismatic authority. The administration is everywhere, being gradually bureaucratized.

With the rapid industrialization and increased work load of administration, the need of bureaucracy has been tremendously. It was due to this necessity that the management of large scale industries requires a particular class which will be called a managerial class to manage the administration. This generated the need for bureaucracy, which many people also call as manageralism.

2) **The Power Bloc Model :** It deals chiefly with the concept that in advanced capitalism, how the big corporation are controlling political and economic power. Unlike Weber, Marx did not develop a well-knit theory of bureaucracy, but he was quite aware of its existence and importance in capitalist country. According to him, bureaucracy is a machine/tool used by the bourgeoisie. "He was thus concerned less with the bureaucracy as a broader social phenomenon, but more with the class role played by the state bourgeoisie. In particular, he saw the bureaucracy as a mechanism through which bourgeoisie interests are upheld and the capitalist system defended".

Nevertheless in the analysis by Marx, we have seen bureaucracy to be the mechanism of class rule whereby Weber considered as the mechanism of administration. Bureaucracy and the capitalism /capitalist work together for furtherance of the economy controlled by capitalist. These bureaucrats basically are the members of higher class and division who received education from the best of the schools right from their childhood. Henceforth they have developed a strong affinity to their own class. Ralph Miliband has said, "the social provenance and the education of class situation of top civil servant make them part of a specific milieu whose ideas of prejudices and outcome they are most likely to share and which is bound to influence their views of national interest. He further maintains that the top civil servants are conservatives in their outlook and political ideology and this makes them very much close to the capitalist class. Whenever if any anti-capitalist measure is going to be adopted, the top bureaucrats of the state administration-by hook or by cook-scuttle the attempt.

Thus Heywood concludes "a major implications is that if senior bureaucrats are wedded to their interest of capitalism, a major obstacle stands or the way of any attempt to achieve socialism through constitutional means". This acts as a power bloc. The socialism wave or feeling made bureaucracy more conscious and its role as a machine of class rule was sharpened.

3) **Bureuacracy Over-Supply Model** : The concept of bureaucracy have been divided into two groups. Karl Marx who is the exponent of one such view which branded it as an instrument of class rule, the spokesperson of another view is that of German Thinker Max Weber who believes that to tackle the complex of any modern administration, the bureaucracy is an inevitable instrument. For him, bureaucracy is not a machine of class repression but a machine for smooth conduction of administration.

6.6 Historical background in India

In India, Lord Cornwallis is credited for creating the bureaucracy system as we know it today. The ICS was the culmination of steps initiated by him. Initially, the Indians were debarred from holding higher position. It was from 1850's that this opened up. We can cite Subhas Chandra Bose, K.P.S Menon, and T.N Kaul. Hence many nationalist leaders were critical about ICS as they serve the "steel frame of the British Empire". This practiced to promote and preserve the interest of British administration through the use of bureaucracy prevailed till 1947. After the independence, Indian bureaucrats were entrusted with the key responsibility of nation-building and they quite successfully done it both in social and economic development while its nascent democracy initial years.

Post independence, the same bureaucracy who once continued with the loyalty to the British masters switched the loyalty to the Indian leaders. Under the leadership of "politicians", this very strong bureaucracy who was known as the steel frame of Indian administrative got engaged in the development of nation. It has assumed a newer and changed role . They have been asked to shoulder the task of formulating and implementing the schemes of instituition changes in the economic and social spheres. In rural areas, there has been greater penetration of governmental activities.the chief purpose was through welfare organizations , it aimed to improve the condition of the weaker sections of Indian society. Henceforth with the role of all

pervasive, the bureaucracy has to shouldefr ever increasing newer responsibilties in a new set up.Unfortunately with sporadic rising of several issues and demands, the bureaucracy failed to meet up with this changing social and political environment. The colonial administrative structure meant only for maintaining law and order and collecting revenues, proved futile in implementation of various developmental programmes which were undertaken then.

With inadequate training, the bureaucrats failed to visualize the changed scenerio which turned from being authoritarian to being a coordinative one.The devotion and commitment of the public servant towards public service become low. Instead of devoting and serving to the common cause, they started fulfilling their own self interest. To make matter worst, the elitist character of Indian bureaucrats nurtured in a colonial tradition remained unchanged. With the rising recruitment of the members from the lower income groups in an adminstrative services in the recent years , ipso-facto helped in de-bureaucratization of the higher bureaucracy.

It was quite evident that the bureaucracy somewhere failed vehemently to establish the purpose for which they were recruited. This cult was thoroughly observed not only in India but throughout worldwide. Under such circumstances, to discuss the need of changed atmosphere, in the second **Minnowbrook Congress (**1988), it was felt that the public administrator needs to be more proactive in performing their duties and openness and people's participation. The **New Public Administration** made plea for such response to the new demand. The **Public Choice theory** questioned the basis of bureaucracy and New Public Administration perceptive evolved being inspired by the theoreticians.

The attack upon bureaucracy has become more severe since 1990s. With Liberalization, Privatization and Globalization model pouring in and after three decades , it had become clear that the market model has also many drawbacks and limitations. Gradually, the working of bureaucrats started to suffer from the problem like politicalization. It started to be less efficient and less effective and failed to live upto the expectation of the society. Nevertheless in 21st century, there is no denying that bureaucracy is not the lone instrument of governence, it is still the pivotal one while formulation of policy and implementation. Bureaucracy is the best technique in order to faciliate the democractic system smoothly. Bureaucracy is the sub-system of the political system under which it works. So the former is likely to be affected by the latter. According to Eisenstadt, political development cannot be achieved without the sufficient involvement of bureaucracy. It can be used as a tool for social reconstruction. According to F W Riggs, in developing countries , there needs to be balance between political and bureaucratic development to achieve over all development. This he calls,"Balance of Polity."

6.7 Challenges to Bureaucracy in 21st Century

With the concept of induction of LPG (Liberalization, Privatization and Globalization) since 1990s there are chiefly three types of problems which the bureaucracy have been facing. These are as follows:

a) The bureaucrats are using their own expertise, knowledge and power to fulfil their own interest at the cost of public interest. At times, they influence politicians. Sometimes they make the process of

working complex through rigidity and red-tapism. Hence the esence of responsiveness to the people is destroyed, which in turn breeds corruption and inefficiency.

b) There are many incidents where the bureaucrats get politicised either to get a favour or under heavy pressure. It destroys the quality of civil service. Often the bureaucrats are compelled either to work for the political parties or for some narrow vested interest. Hence the objective to work and serve for common mass is in serious danger. Too much of unwanted political interference mars a honest officer to work for the larger interest. At times, this attitude and problem of politicisation leads to criminalisation of administration. One such example can be cited is of 2002 Gujarat carnage. It is a typical example of both politicization and criminalization of administration. If the upward officer refuse to obey the illegal orders of the elected executives, they have to face a number of problem. Sometimes they are harassed to any extent and even they can get killed. The good officer are transferred at frequent rate with unfavourable places reduced to insignificant post where there is little or no work to be done. Often bigger scams or corruption is the result of liasion of politician and bureaucrats. In 2010, the Cabinet Secretary which happens to be the highest government official admitted that the bureaucracy has failed drastically due to widespread corruption and malpractice.

c) The third challenge which the bureaucracy is facing is that the form of competition with other actors and the people's demand and expectations. In the era of privatization, this government sector is facing neck to neck competition from several quarter. In todays' governance with the particiapation of the citizens, work of the bureaucrats are always under public gaze. This situation is further stressed out by the role hyper active media who is ever ready to serve people with aggravated incidents in their timeline. Hence the role and challenges of the bureaucrats is to brig all of these players to table for negotiation and faciliate policy making , taking of all them into confidence.

d) Fourthly, there is an adequate dearth of leadership qualities amongst the administrative officials. Very few political executive welcome free, frank and impartial advice from the permanent executives. Often it has been found that political executives encourage advice which fulfill ther own personal and vested interest. They want the bureaucrats to work according to satiate their own personal interest rather than to serve for the common good.

e) Finally, Singhi holds that the contemporary bureaucratic system is excessively prone to the practice and performance of routine administrative tasks and is unable to achieve the goals of national development. Indian society, historically speaking has a rigid stratified social system, the prevailing bureaucracy system is also rigidly stratified having a caste-based structure and favouring the upper hierarchy I bureaucracy. The bureaucracy system has concentration of authority and decision making power in the hands of the elite cadre and it trends to the power orientated.

6.8 Differences in Bureaucracy in Western countries versus India

For western countries, the social changes and modernization took place mainly owing to indigenous factor. This in turn is in sharp constrast with country like India, where social changes and modernization were the direct outcome of colonial domination. The incompletion of modern process, which also includes underdevelopment of bureaucracy has lead to the perpetuation of authoritarian values and weakning up of the democractic spirit in India. In India, modern bureaucratic structure was superimposed by the colonial rulers. Democracy here was followed, not preceded. This resulted Indian bureaucracy ill-adopted with the party democratic which is unbefitting with the colonial tradition of the civil servants. In constrast to the Western world, modern bureaucracy followed modern democracy, there has been comparatively better adjustment between the two.

Role of Indian Bureaucracy

The following are the different roles which a abureaucracy have to perform

a) **Implementation of governmental policies and laws**: It is the responsibility of the bureaucracy to carry out and imoplement the policies and laws that can really serve the objectives only when these are effeciently implemented by the civil servants.

b) **Role in Policy formulation:** it is the role of the legislator to make the policy. However, it is the function of the bureaucrats to implement them. As the civil servants are the best of the brains recruited from, received training and dfferent orientation programmes, they have an expertise knowledge in providing the data needed by the political exeeutives for formulating the policies. Infact the civil servants formulate the several alternatves policies and describes the merits and demerits of each. It is upto the political executives to select and adopt one such policy alternative as the governmental policy.

c) Running of Administration : running and maintaining the daily administration in accordance with the policies, laws, rules , regulations and decisions of the government is the key responsibility of the bureaucracy. The poltical executive simply exercuses guiding ,controlling and supervising function.

d) Advisory functions: the prime function of the bureaucrats is to aid and advise their political executives. All sorts of informaton and advisee regarding the function of the respective department is being served to the political executives by the bureaucracts. As new to the department, the ministers have little knowledge about the functions of the particular depaartment. Qualified , experienced and expert civil servants working in all governmental departments provide expert and professional advice and information to the ministers.

e) Role in legislative works : the civil servants play an important but indirect role in law making. They draft the bills which the ministers submit to the legislature for law making. They provide all kinds of information asked by the legislature to the ministers.

f) **Semi-judicial work :** the emergence of the system of administrative justice, under which several types of cases and disputes are decided by the executives has further been a source of increased semi-judicial work of the bureaucrats. The disputes involving the grant of permits, licenses, tax concession, quotas etc are now settled by the civil servants.

g) **Collection of taxes and disbursement of financial benefits :** the civil servants play an crucial role in financial administration. They advise the political executive in respect of all financial planing, tax-structure, tax administration and the like. They collect taxes and settle disputes involving the recivery of taxes. They play a significant role in preparing the budget and taxation proposals. They carry out the function of granting of legally sanctioned financial benefits , tax releifs, subsidies and other concession to the people.

h) **Record keeping :** it is their prime duty to maintain all governmental records systematically. They collect, classify and analyse all datas pertaining to all activities of the government. They collect and maintain vital socio-economic statistics which are used for the formation of public policies and plans.

i) **Role in PR :** with the ushering of an era of modern welfare and democratic state , it has become necessary for the govrenment to keep close relation with people of the state. It is crucial to maintain the liasion and for this an active PR is the capital necessity. They act as the bridge between the government and the common masses. They serve as the two way road. On one hand, they carry information from the government to the people whereas on the other hand, they present the views, opinions of the people to the political executives. Hence they act as the excellent mechanism whereby one can feel the pulse of the common masses. Hence there is no denying that the bureaucrats play a significant role for the smooth functioning of the government.

What is neutrality in bureaucracy means?

Neutrality in common sense means impartiality. A neutral bureaucracy is the key factor in today's era, where the concept of democracy, good governance and transpiracy holds a great meaning. It is the permanency tenure of the bureaucrats which helped them in an upper edge than the ministers who have a short term perceptive as they are related to the elections. These bureucrats have an access to lot of confidential informations as they have time to explore and read them which they have garnered from their long time experince than that of their poliical executive who come and go. Bureaucrats are basically technically qualified and given training periodically whereas the ministers are amateur in this field.

Secondly it has been found that speciaqlly for Developing countries, interest groups and political parties are either weak or non-existent. Electoral system are often defective and the practice of tardition and coventions of democracy is not been well-established. Hence under such circumstances , dependence upon the bureaucracy is more important and it has to be neutral.

Classifications of Neutral Bureaucracy

Neutrality of the bureaucracy can be made into three categories which are as follows:

a) **Neutrality between classes** : Modern society is consisted of various classes such as landlords, capitalists, traders and workers. The government is expected to take care of the interest of these groups and to allocate and use their resources meaningfully. The bureaucracy is the government's main instrument which must be and has to be neutral neutral if justice amongst the classes have to be achieved. the sole reason that it becomes difficult to achieve justice as different class have different interests which in terms as very much conflicting with each other. For example: if a manufacturer pays higher wages to his workers, his profits get reduced to that extent. Similarly if a landlord gives a higher share of the crop to his tenant farmers, he suffers a great loss. It is only if the government and tge bureaucracy are seen to be neutral, that the conflict can be kept within the limits and peace maintained.

The conflict is greater in developing countries like India than that of the developed nations. The neutrality of bureaucracy ensures to bring development. The classes of big industrailists and big farmers have a lot of political and economic power and trend to monopolise these gains. However development means that the smaller industries and farmd should also make substantial profits. Only in that case can we say that justice have been delievered. Hence it is important that the bureaucracy which distributes these facilities should also do impartially and justly. The recruitment should be made from more broader base as 70 % of the IAS officer comes from urban, salaried or professional middle class. This indicates that the farmers and worker who constitute the majority of thepopulation, remain grossly under-represnted. If the bureaucracy were more representative, it would like likely be more neutral.

b) Neutrality between cultural groups : the conflict between cultural groups are often accentuated by socio-economic factors. If we look into the contours of Indian lanscape , we will find that most Sikhs in Punjab have a rural background, while most Hindus have an urban one. Members of Schedule Caste have a lower social status than others. Many of them are landless labouer. One of the effects of such disparities is that cultural group having a lower social and economic status which has lower representation in bureaucracy also. Such a bureaucracy , with higher representation of certain groups than others, is ofetn not percieved as being neutral. Hence the reduction of this difference is needed

c) Neutrality between political parties : democracy made its head a way in the middle of 21st century for the developing nations. The spoil system is often tended to exist despite of being Civil Service Commission. In India, there are several provisions which ensures the independence of Publc Service Commission. Secondly , it is the development of loyality for political power mars the very performance of the bureaucrats. The neutrality under certain situation cannot be ensured. According to the Shah Commission, this problem existed during the Emergency (1975-1977) in India. The nexus between the political executives and bureaucracy is still rampant in modern days.

Why committement bureaucracy/neutral is needed?

Dedication or Committement is needed because of the following mentioned causes:

a) Neutrality depends or define that the public officials are not the slaves to either the politicians or of any other authority other than the moral authority of the constitition. It shows that the principle of neutrality implies a maesure of independence both from the partisan interests of the government of the day and the exogenous agendas that prompt certain social groups to cow other down to humiliating vulnerablity.

b) Bureaucracy should be neutral in terms of ideology and politics so that there is not be any affinity to a particular class or ideology. More post retirement, these public offcials can make significant mark by joining into social service or for causes without joining any political parties. They can fight against any political parties which shows scant constitutional principles . henceforth it all depends upon bureaucrats to maintain distance within working or any post retirement projects.

c) If bureaucrats would not be neutral then it cannot lend its whole hearted support to the existing politicsl system and to the economic and political system if any radical changes are to be introduced.

d) Without neutrality, there can be a close nexus between bureaucracy and large scale enterprise which could further lead to crony capitalism.

e) In developing countries, there are several classes and their sub-sections which often leads to conflict and confusion. These officials should remain neutral otherwise, they will only support the group which protects the vested interest of the bureaucrats.

f) Public officials have two inter-realted moral functions:

Firstly, the bureaucracy has to protect the very state of which it is a part from being disrupted or being undermined by the disquieting elements of the Civil Servants

Secondly, the bureaucracy has to prevent the disruptive efforts of a society that is ridden with caste and patriarchial consciousness. Bureaucracy has to intervene in public life so that the society does not degenerate nto aggressive obscurantism.

As P.V.R Rao puts it, the bureaucracy should be committed,neutral and loyal to the policies of the government in power to certain limit, but not at the cost of liquidation of the important safeguards of the citizen ie, the need to redress social and economic inequalities. Mr Jagjivan Ram in his Presidential speech to the Congress, opined that "Neutrality of the Civil Service was a hinderance. We used the Civil Service that is committed to the ideal of democracy, socialism and secularism. The theory of Neutral Bureaucracy is hardly relevant to Indian condition".

Recently, Prime Minister Narendra Modi has amended 46 years old conduct rules for the top bureaucrats to include new provisions. As many as 19 provisions have been inserted so that to ensure better, smooth and more efficient working of the bureaucracy. Special care has been taken in order to ensure and maintain high

ethical standard, integrity, honesty, accountibilty and transparency with maintaining highest degree of professionalism.

6.9 Self Assessment Questions

a) Define the role of Bureaucracy.

b) Write about the salient features of Bureaucracy.

c) What are the challenges of modern Bureaucracy?

d) Why do we need a neutral Bureaucracy?

e) Define Weber's model of Bureaucracy.

f) Mention the different classifications of neutral Bureaucracy.

6.10 Suggested Readings

i. Bhushan, Prashant. (2004). Supreme Court and PIL: Changing Perspectives Under Liberalisation. *Economic and Political Weekly , 39* (18), 1770-1774.

ii. Kashyap, Subhash C. (2004). The Executive-Legislature Interface in the Indian Polity. *The Journal of Legislative Studies , 10* (2-3), 278-94.

iii. Laxmikanth, M. (2017). *Indian Polity* (5th ed.). Chennai: Mcgraw Hill.

iv. Rao, Mamta. (2018). *Public Interest Litigation- Legal Aid and Lok Adalats* (5th ed.). Eastern Book Company.

C.C : 2.2

Unit-7

Elections and Electoral Reforms in India

Contents :

7.1 Objectives

7.2 Introduction

7.3 Modes on Election

7.4 The Election Commission in India

7.5 Outcomes of Elections in India : A Brief Overview

7.5.1 1952-67 : One Dominant Party System

7.5.2 1967-71 : Initial days of Coalition politics in India

7.5.3 1971-77 : Towards Emergency

7.5.4 Post Emergency : Janata Interlude and its aftermath

7.5.5 1991 onwards : Towards a New Millennium

7.5.6 2000 onwards

7.6 Characteristic Features of Elections in India

7.7 Electoral Reforms in India

7.8 Conclusion

7.9 Self Assessment Questions

7.10 Suggested Readings

7.1 Objectives

This unit would enable a clear understanding of elections and electoral reforms in India, both from a legal and a political aspect. The unit in this context will further discuss about the Election Commission of India and its structure and functions.

7.2 Introduction

Unlike many third-world countries, in India power does not come from the 'barrels of guns', but from the ballot boxes or now, from the electronic voting machines (EVMs). In India, elections are held at regular intervals and is considered to be an important event in the political life of the nation. To many, elections in India can be compared to 'joyous celebrations', 'festivals' because of the sheer number of people

participating in this process. Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, tried instilling a deep regard for democratic institutions and practices in the country. He was fearful of falling prey to dictatorial temptations, so he wrote as Shashi Tharoor points out, an anonymous article using a pseudo name regarding himself, that stated, "He must be checked. We want no Caesars." The hallmark of democratic governance is parliament's supervision and control over the executive and as a result of which, free, fair and regular elections, to elect peoples' representatives is a must.

Dr. Ambedkar had warned against the possibility that Indians might be simply content with political democracy, which would mean a half-way victory. Without attaining equality and fraternity for the whole of society, democracy would not hold much of a meaning. In 1949, when Ambedkar made such a statement, India was divided into thousands of castes, that challenged the idea of a single nation. To this effect, the adoption of universal adult suffrage, as per article 326 (it was 21 years then, later 66th Constitutional Amendment in 1988, lowered it to 18), institutions run by elected representatives, attempts at accommodation of the down-trodden for self-realization and participation in governance, strengthened an idea of democracy that was perceived to be revolutionary. Why? Cause it helped to do away with multiple hierarchies at play and freeing many out oppression. To what extent, has that been successful is a matter of another debate.

Right after independence, political participation was confined to participating in elections as it was much later, that other forms of political mobilization started to emerge. India had adopted a federal structure and a parliamentary model. India's parliamentary system is based on the Westminster model of constitutional democracy (borrowed from the British). The Parliament is bicameral in nature, comprising an upper house or Rajya Sabha (Council of States, having a membership of 250); and a lower house or Lok Sabha (House of the People, having a membership of 545, where 543 are directly elected by the people). Due to the federal nature, states have legislative assemblies and in some cases councils as well. As the leaders wanted to have a democratic society, all the political posts are elected directly or indirectly. For, this the Constitution of India, has empowered the Election Commission of India, to act as a fair, impartial supervisor. It is entrusted with the election process including the election of President, Vice-President, members of the Lok Sabha and members of the legislative assemblies (Art. 324 [1]).The State Election Commissions are entrusted with the duty of supervising polls at the local levels (municipality, panchayat etc.).

Important concept linked with elections, is the concept of *suffrage*. It means the right to vote or the right to franchise. When the people are given the right to elect their representatives through the exercise of the ballot, they are designated as *electorate* and their right to vote is described as the system of suffrage. Who could/can vote?

- In the 19th century, right to vote was dependent on property, sex, educational qualifications. When franchise was linked with property it was called Franchise based on property. It was argued that legislature that decides on taxes should be elected by those who own properties and pay taxes.
- Then there was the view that only educated people should have the right to vote as they are the only ones understanding the problems of the state, economy etc. and would vote in a just manner.

- Earlier, women were denied voting rights. Women's suffrage movement has a long history of struggle to get women the basic fundamental right to vote. However, in India women from the very beginning has been given this right by the constitution of India and is also protected by it. It upholds the equality clause as adopted in the constitution.
- Nowadays, the universal adult franchise is adopted by all the democratic countries, implying that the right to vote is guaranteed to both men and women alike however, they have to above a certain age.

Another important thing in elections is the *constituency*. A constituency is a basic electoral unit into which eligible electors are organized so that they can elect representatives to a legislative or other public body. The registration of electors is also usually undertaken within the bounds of the constituency.Linked to this, is the concept of *delimitation*. It refers to the redrawing of the boundaries of parliamentary or assembly constituencies to make sure that there are, as nearly as practicable, the same number of people in each constituency. Boundaries are meant to be readjusted after the ten-yearly census to reflect changes in population, for which Parliament by law establishes an independent Delimitation Commission, made up of the Chief Election Commissioner and two judges or ex-judges from the Supreme Court or High Court. However, under a constitutional amendment of 1976, delimitation was suspended until after the census of 2001, so that states' family-planning programmes would not affect their political representation in the Lok Sabha and VidhanSabhas. This led to a few discrepancies in the size of constituencies.

7.3 Modes of Election

There are two ways :

a) Direct- People directly electing their representatives.

People/voters ⟶ elect ⟶ directly elected representatives like MPs of Lok Sabha or MLAs of Legislative Assemblies.

b) Indirect- When people elect their representatives through their intermediaries. The President, Vice President, MPs of Rajya Sabha and Members of Legislative Councils are elected in this way.

People /voters → elect members of an electoral college/intermediaries elect (through their voting rights) elected representatives of the people.

India has adopted the First-past-the -post system for elections to the Parliament or to the state legislatures. If in a constituency, one person receives even one popular vote more than the runner-up, then he or she is declared as the winner. The limitation of such a system is that, in a multi-party system like India,it could so happen that the winning candidate does not obtain more than 50 percent of the polled votes and yet goes on to represent the whole constituency. For example, say there are 100 voters in a constituency and candidate A receives 40 votes, candidate B gets 29 and the remaining 31 votes are split among candidates, C and D.Then, as per this system, candidate A wins with 40 votes and represents the constituency in the legislature (e.g. Vidhan/Lok Sabha).

India has also adopted the method of **indirect election**, while electing members of Rajya Sabha, Vidhan Parishad (Legislative Councils), President and the Vice-President of the country. Rajya Sabha members are elected indirectly by the people, that is, by the members of a state's Legislative Assembly through the system of proportional representation with the single transferable vote (STV) system.As per Article171, Legislative Council of state cannot have MLCs more than one-third of total number of MLAs of state assembly and not less than 40(with the exception of Kashmir). One-third of them areindirectly elected by local MLAs, another one-third by local bodies like municipalities etc., one-twelfth each by an electorate of teachers and registered graduates and others nominated by the Governor from field of Science, Art, Literature etc. Both the President and vice-President are elected by an electoral college in India.

7.4 The Election Commission of India

Articles 324 to 329 deal with elections in India. The Election Commission of India (EC) is an autonomous, constitutional body set up for the purpose of "superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament…Legislature of every State…offices of President and Vice-President," (324 [1]). Initially, the EC was a single membered body but on the eve of the 9th general elections, Rajiv Gandhi's appointed two other commissioners to impose checks on the acts of T.N. Sheshan. Thus, in 1989, it became a multi-membered body. As per the constitution, the President appoints the Chief Commissioner of India and other Election Commissioners (324[2]). As per Art. 324 (3), the Chief Election Commissioner will act as the 'Chairman', if other commissioners are appointed. As per the EC in India, the total number of Electors is 834,082,814; total number of polling stations is 9,27,553 and the total number of assembly constituencies is 4120. Male Voters count is 437,035,372 and that of female voters is 397,018,915.

Let us now look into the main functions of the Election Commission :

1. The Election Commission of India is considered the guardian of free, fair and regular elections.
2. The Election Commission prepares the electoral rolls and based on those, arranges for photo identity cards for each constituency that contains the names of all eligible voters. The electoral rolls are then published for public scrutiny, so that any error incurred can be corrected.
3. It also decides the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament.
4. It fixes dates of elections and informs the public about the election schedules.
5. It decides dates for submission and withdrawal of nominations and lays down procedures for scrutiny of nomination papers.
6. It issues the Model Code of Conduct in every election for political parties and candidates so that the decorum of democracy is maintained, in that way it conducts and supervises elections.
7. It declares election results after counting of votes.
8. It regulates political parties and registers them for being eligible to contest elections. It recognises a

political party and allots symbols for elections. To that effect, EC appoints the following-

- **Chief Electoral Officer —** ECI in consultation with State Government/Union Territory Administration nominates or designates an Officer of the said State/UT as the Chief Electoral Officer to supervise the election work in the State/UT.
- **District Election Officer —** ECI in consultation with the State Government/ Union Territory Administration designates an officer of the said State/UT as the District Election Officer to supervise the election work of a district
- **Returning Officer —** ECI in consultation with State Government/Union Territory Administration nominates or designates an officer of the Government or a local authority as the Returning Officer for each assembly and parliamentary constituency. Returning Officer is responsible for the conduct of elections in the parliamentary or assembly constituency and may be assisted by one or more Assistant Returning Officers (again appointed by ECI) in the performance of his functions
- **Electoral Registration Officer —** ECI appoints the officer of State or local government as Electoral Registration Officer for the preparation of Electoral rolls for a parliamentary/ assembly constituency

9. In case of disputes, the Election Commission can order repolls.
10. The Commission also appoints tribunals for the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with election to parliament and State Legislatures.
11. It publishes the allowed limits of campaign expenditure per candidate to all the political parties, and also monitors the same.
12. The political parties must submit their annual reports to the ECI for getting tax benefit on contributions.
13. It guarantees that all the political parties regularly submit their audited financial reports.
14. The Commission also offers advice to the President on matters relating to the disqualification of a member of Parliament. Similarly, it advises Governor about disqualification of a member of State Legislative Assembly.
15. The Commission can repress the results of opinion polls if it deems such an action fit for the cause of maintaining peace and harmony.
16. The Commission can recommend for disqualification of members after the elections if it thinks they have violated certain guidelines.
17. In case, a candidate is found guilty of dishonest practices during the elections, the Supreme Court and High Courts consult the Commission.
18. The EC from time to time might request the President or the Governors to make available staff necessary for the discharge of functions (324[6]).

Appointment and Tenure of Commissioners :

- The President has the power to select the Chief Election Commissioner and other Election

Commissioners.

- They have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier.
- They have the same status and receive pay and perks as available to Judges of the Supreme Court of India.
- The Chief Election Commissioner cannot be removed from office except in the manner, a judge of the Supreme Court would be removed (324[5]).
- Election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner (324[5]).

7.5 Outcomes of Elections in India : A Brief Overview

From 1946-49, the Constituent Assembly, acted as the first Parliament of India. It consisted of indirectly elected representatives and was set up for the purpose of drafting a constitution for India. The Assembly was not elected on the basis of universal adult suffrage, Muslims and Sikhs were given special representation as minorities.

7.5.1 1952-67 : One Dominant Party System

In the first election, elections were held in 489 seats. As per the archives of Lok Sabha, the total number of eligible voters were about 17.3 crore. The Indian National Congress (INC) won 364. Other parties winning seats comprised CPI (16 seats), the Socialist Party (12 seats), Bharatiya Jana Sangha (predecessor of present BJP had 3 seats), Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha (4 seats), Peoples Democratic Front (7 seats) and others. The Congress polled closed to 45% of the total vote and Jawaharlal Nehru was elected the Prime Minister. The second election saw Congress winning 371 seats out of 494 seats. Two other parties won double digit seats like the CPI (27 seats) and the Praja Socialist Party (PSP) (19 seats). The Congress polled closed to 48% of the total vote. The BJS won only 4 seats.

The Independents won the second highest number of seats after Congress in both the first and second general elections. Jawaharlal Nehru was again elected the Prime Minister. There was no official Leader of Opposition during the second Lok Sabha (LoP). Out of 494 seats, the Indian National Congress (INC) won 361 seats in the third general elections. In these elections, four other parties won double digit seats (CPI, Jan Sangh, Swatantra Party & PSP). The Congress vote share was reduced to about 45% from 48% in the previous election. Jawaharlal Nehru was elected the Prime Minister. But after he passed away in 1964, Gulzarilal Nanda was made the interim PM who was succeeded by Lal Bahadur Shastri who held the post for about 19 months before his death. Indira Gandhi then took over in 1966.

Contrary to Myron Weiner's of a multi-party system in India, Rajni Kothari, Morriss-Jones, Duverger and others described this period as a one dominant party system. According to Rajni Kothari, the Congress consisted of a "party of consensus and parties of pressure", the latter functions on the margin. The concept of a margin of pressure is of great importance in this system. Internal to the margin are various opposition groups and parties. External to the margin are various opposition groups and parties, dissident group from

the ruling party, and other interest groups and important individuals. The role ofthese groups on the external margin is not to replace the ruling party but to constantly pressurize it, criticize and censure it, influence it by influencing opinion and interests in the internal margin.

7.5.2 1967-71 : Initial days of Coalition politics in India

From1967-1971 there was fragmented and competitive party system. After thegeneral election of 1971 one dominant party system reappears in Indian political system. During the emergency it was one party system again. However, it is important to note that, in the first state assembly elections of 1952, the Congress won clear majority in all states except Madras, Travancore-cochin, PEPSU, and Orissa. In Rajasthan, it barely made it to the majority. In 1954 state assembly election was held in Travancore-Cochin and coalition government was formed by Praja Socialist Party (PSP) with the support of the Congress. The Coalition government was also formed in Orissa between the Congress and Gantantra Parishad in 1957 which lasted till1967. In Kerala from 1960-1964, coalition government ruled, It was the coalition between PSP, Muslim League and the Congress.

Therefore, Despite the Congress dominance coalition politics at state level was prevalent from the very beginning.In 1967, the Congress hegemony was reduced in the nine states – Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Kerala, where the non-Congress governments were formed. Rajni Kothari has described the nature of Party System during theperiod (1967 to 1971) as that of "competitive dominance" .The anti-Congress sentiment was also on a rise and united different non-Congress political parties, having different ideological orientations at the state level. Thus, in Bihar, UP, MP the SamyuktaVidhayakDal came to power by forming an alliance between Socialist Parties and Jana Sangh. In Punjab the Popular United Front was formed which consists of Alkali Dal (Sant- group), Alkali Dal (Master group), CPI, SSP, Republican Party and CPI (M). In West Bengal, the United Democratic Front government was formed which consisted of CPI (M), the Bangla Congress, and the fourteen other parties and had Ajoy Mukherjee as the Chief Minister. In Kerala United Front ministry was formed which consisted of CPI (M), CPI, SSP, RSP, KTP, KSP and Muslim League. In Orissa, SwatantraParty with help of the Jana Congress formed government.

7.5.3 1971-77 : Towards Emergency

In 1969, there was a split in the Congress. But after the elections of 1971, the Congress was no longer the party of consensus and the opposition was no longer functioning as pressure group but had become ambitions and the parties were aiming to be in power. After India's successful involvement in Bangladesh's Liberation War of 1971, Indira Gandhi became more powerful. However, soon corruption was a serious problem and Jaiprakash Narayan, came out of his retirement from politics and launched two massive movements in Bihar andGujarat, aiming to fight corruption at high levels. After a judge of AllahabadHigh Court annulled Mrs. Gandhi's election to the parliament in 1971 on theground ofunfair electoral practices, instead of stepping aside till Supreme Court's verdict, Emergency was declared.

7.5.4 Post Emergency : Janata Interlude and its aftermath

Jaiprakash Narayan brought all the parties intending to oust Congress from power, under the banner of

a single party, naming it Janata Party. This party aimed at restoring Indian democracy, curbing the authoritarianism of Indira Gandhi. Congress Organisation, Bharatiya Jana Sangh, Bharatiya Lok Dal and Samajvadi Party came together to form Janata Party. Morarji Desai became the Prime Minister. However, due to differences between Morarji Desai and Charan Singh, the Janata experiment came to an end. In 1980, Indira Gandhi, once again came to power.

However, after the assassination of Indira Gandhi in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister. He promised to holdparty elections, and to do away with power-brokers. This made himpopular. Faced with scandals during Rajiv Gandhi's tenure, the Congress lost power in 1989 as some of the erstwhile members of Janata Party came together to form Janata Dal, which was led by V.P. Singh. It came to power with the support of now BJP, the left parties supported from outside. However, this was short lived too. As the BJP withdrew its support to the National Front minority government, a non-confidence motion was passed against V.P Singh led National Front minority government on November 7, 1990. The fall of National Front led to split of the Janta Dal when Chandrasekhar who along with his 55 members formed the Janta Dal (Samajwadi), and staked the claim for forming the government with the outside support of the Congress. It was on November10, 1990 that Chandra Shekhar was sworn as the Prime Minster. When Congress, withdrew support in 1991, this government failed too.

7.5.5 1991 onwards : Towards a New Millennium

During the 1991 election, the Ram Mandir vis a vis the Babri Masjid issue did play an important role, however, the assassination of Rajiv Gandhi in between the election gave new turn to election. There was a hung Parliament at the center. In this election the Congress emerged as the largest party, with not too much strength to form the government on its own. The Narasimha Rao government first started as a single party minority government but during later half it got support from Ajit Singh and its position strengthened.

After the eleventh general elections, there was a hung Parliament and BJP with only 187 seats formed the government under Atal Bihari Vajpayee, due to strategic pre-poll alliance with various parties. However, this government toppled after just thirteen days and the President called upon H.D. Deve Gowda to form the government as the leader of the United Front. The United Front comprised National Front, Left Front, 13 other parties and the Congress supported from outside. When in 1997, Congress withdrew support, the government lost majority support. In the next election in 1998, the BJP with its old allies and new partners emerged as the largest alliance to have won the election. It was around this time that the Manipur State Congress (Manipur), the Loktantrik Congress (UP), the Trinamul Congress (West Bengal), the Himachal Vikas Congress (Sukhram) and later the Nationalist Congress Party of Sharad Pawarwere formed after parting ways with the Congress party. When AIADMK of Jayalalitha, withdrew support, the ministry fell from office.

Showing apathy to coalition government, Sonia Gandhi failed to cobble together a minority government with outside support, when Vajpayee lost power. After, India's success in the Kargil War, the BJP led NDA (National Democratic Alliance) government came to power and Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister. The Akali Dal, Biju Janata Dal, Trinamool Congress, Janata Dal United ,DravidaMunnetraKazhagam, Telegu Desham Party were some of the coalition partners.

7.5.6 2000 onwards

The Congress came to power as the single largest party in both 2004 and 2009LokSaba elections (14th and 15th General Elections).Unlike the previous times, Congress successfully led coalition governments (United Progressive Alliance or UPA I and II). Congress under the leadership of Sonia Gandhi shed its differences with the regional forces and struck pre-poll alliance with the important, state and regional forces like RJD, DMK, TRS (TRS was not part of 2009 election), JMM, LJP etc.UPA-I government support of the Left Front, SP, BSP etc., these parties supported from outside.

However, after a series of scams, slow growth rate, BJP led NDA government came to power and Narendra Modi became the Prime Minister.The BJP won majority on its own with 282 seats while the Congress recorded its worst ever performance with just 44 seats. This was the first time since 1984 that a party won a majority on its own. Though Narendra Modi, failed to keep much of his promise of bringing back black money, solving the problem of unemployment etc, Pulwama attacks and surgical strikes, sent the message of a strong government at the center, and people re-elected this government with more seats to BJP (303 seats).

7.6 Characteristic Features of Elections in India

From the above discussion, we can deduce as to what are the key features of elections in India. Apart from those, a few important features have also been added.

First, from a one dominant party system, elections are nowadays fought between mainly two blocs—the ruling party and its coalition partners and the main opposition party and its partners. Though there was a non-Congress, non-BJP Mahagathbandhan, it was an important part of the opposition only. Now one can see one dominant party system, back in the political frame, with BJP replacing Congress in the last two general elections.

Second, India continues to be a multi-party system which is completely in tune with the federal structure as adopted in the Constitution. The fall of Congress' support since the 60s revealed that it is not possible for a single national party to fulfil the aspirations of the various sections of the people. In a country that is so diverse in nature, multiparty system seems like a logical answer to fulfilling aspirations of various categories of people.

Third, though traces of coalition can be seen in the 50s, coalition politics is an important feature in Indian elections and one can say that coalitions are here to stay. Coalition attempts at reaching for a wider consensus and thus curbs autocratic tendencies. However, it also threatens government, when the main partner doesn't have enough seats like it happened with Prime Minister Atal Vihari Bajpayee when AIADMK pulled out.

The fourth one, follows from the above point. With the rise of coalitions around elections in India, an erosion of ideologies can be noticed. Well its true that in politics there are no permanent friends and enemies, but there are parties who have been coalition partners in both NDA and UPA. Since, there is dearth of ideologies, horse trading is rampant in Indian elections. Though election commission has limited the amount each candidate can spend in his or her constituency, we find use of unaccountable cash in Indian elections, which lead to corruption during elections. Absence of ideology, presence of money power would mean that people may be paid to terrorize as well. In elections, thus we find muscle power too. Several parties have

goons working for them, who might unleash terror, if that benefits a certain party in election. Violence scars Indian elections.

Fifth, regional parties have become more and more relevant as Congress' control all over India, declined gradually. Many regional parties where erstwhile part of the Congress like Sharad Pawar's Nationalist Congress Party, Mamata Banerjee's Trinamool Congress etc. or came out of the Janata experiment, like Lalu Prasad Yadavs' Rashtriya Janata Dal and Nitish Kumar's first Samta Party and now Janata Dal (United) and others. In this regard, it needs to be mentioned that *identity politics* plays an important role in elections too. Samajvadi Party, Bahujan Samaj Party and others are caste based parties, which have increasingly become relevant in Indian politics and during elections.

Last, there is dearth of free, fair, unbiased media in India. What the Nira-Radia tapes revealed was an unholy nexus between corporate companies, media and politicians. Various studies done on media in India, suggest the presence of paid media in India, which makes the availability of true, unbiased new, related to elections, impossible.

7.7 Electoral Reforms in India

Electoral reforms as envisaged by the EC, have a long history. Till 1970, EC used to make its recommendations for the amendments through its reports on general elections after the completion of each general elections. In 1970, the Commission sent along with a draft bill to give effect to these proposals which were considered by a Joint Committee of the Parliament in 1971. After this the central government prepared to amend the Representation of the People's Act of 1950 and 51 and introduced the same in Lok Sabha in 1973. However, the bill lapsed on account of the dissolution of the Lok Sabha. In 1977, a review of these recommendations was undertaken. These along with new recommendations were sent to the government of India on October 22, 1977. Since 1980, these recommendations had been revised time and again. On the basis of such exercises the following reforms were made.

The unofficial Tarkunde Committee in its Report on Electoral Reforms (1975), had proposed the constitution of a multi-member EC and the appointment of the Chief Election Commissioners to be made by the President, on the advice of the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India. The government had partly accommodated the proposals by making EC a multi-member body. Partial recommendations of the Indrajit Gupta Committee (addressed the issue of state funding), Vohra Committee (criminalization of politics) suggestions towards reform. Other important contributions aiming for the goal of reforms have been made by the reports of National Commission to review the working of the Constitution (NCRWC) also known as Justice Manepalli Narayana Rao Venkatachaliah Commission, which was formed by NDA in 2000, second Administrative Reprts Commission of 2004 (headed by VeerapaMoily) and Law Commission headed by A. P .Shaw of 2015. Some important reforms are as follows :

- Reduction of voting age from 21 to 18 years.
- Registration of political parties became mandatory.

- A model code of conduct, framed to be followed by all, mandatorily (1990).
- The grant of power to the EC to countermand poll in an entire constituency in case of booth capturing.
- Making the terms and conditions of services of Chief Election Commissioner equivalent to that of a Supreme Court judge.
- Officers or staff engaged in preparation, revision and correction of electoral rolls for elections were deemed to be on deputation of Election Commission for the period of such employment .and these personnel during that period, would be under the control, superintendence and discipline of the Election Commission.
- The amount of security deposit for candidates was raised in order to prevent redundant 'non-serious' candidates. For Lok Sabha it was increased to Rs. 10,000 for the general candidate and to Rs. 5,000 for a candidate who is a member of a Scheduled cast/tribe. For state legislative assemblies or VidhanSabhas, the amount was Rs 5000 for general candidates and Rs 2500 for members hailing from a scheduled caste/tribe.
- Before 2000, laws were made so as to restrict a candidate for contesting election from more than two constituencies. Narendra Modi, Rahul Gandhi are a few who had contested from two constituencies in the recent times.
- Since 2000, ceiling on election expenditure for a Lok Sabha seat has been increased to Rs 40 lakhs in bigger states and it varies between Rs.16- 40lakhs in other states and union territories. Similarly, ceiling on election expenditure has been increased in assembly elections to 16 lakhs in bigger states and it varies between Rs 8-16 lakhs in other states and union territories.
- Political parties need to report any contribution in excess of Rupees 20000 to the EC for claiming income tax benefit.
- Recently we saw that publication or telecast of exit polls during elections to Lok Sabha and Vidhan Sabhas have been declared a punishable offence.
- Though Electronic Voting Machines (EVMs) were first used in 1998 during the State elections of Rajasthan, Madhya Pradesh and Delhi, they have been widely used in the 16thLok Sabha Elections of 2015.
- Voting rights to citizens of India living abroad (who have not received citizenship of any other country) have been guaranteed.
- Further, in 2013, the Central Information Commission (CIC) declared that national political parties come under the purview of the Right to Information (RTI) Act since they get subsidised resources and support from the government. However, all the six national parties refused to comply with such directives.

A proposal was prepared in 2016 (submitted in 2018), when Dr Nasim Zaidi was the Chief Election Commissioner that asked for constitutional protection for all members of the commission, an independent secretariat, decriminalization of politics whereby it had requested more proactive role of the judiciary. The proposed report on reform also consisted the prevention of the use of religion during elections, something that

was partly applied during the 17th General Election. Both Yogi Adityanath and Mayawati had to face consequences while using religion in their election speeches. The proposal also urged to make administrative expenditure of the commission as 'charged' or non-voteable expenditure, just like other independent constitutional bodies like the Supreme Court, Auditor General etc, as otherwise it jeopardizes its independence. Earlier a bill was scheduled to be passed to this effect, but due to the dissolution of the 10th Lok Sabha in 1996, the bill lapsed. Further, faced against the charges that EVMs can be hacked, voter-verified paper audit trail (VVPAT) system was adopted in the 17th general elections. This enables electronic voting machines to record each vote cast by generating the EVM slip, and was introduced in all 543 Lok Sabha constituencies, with the aim of making the election procedure more effective.

7.8 Conclusion

In order to revamp the electoral process, we need serious political will among the politicians and a great amount of awareness, responsibility on the part of common voters. Participation of citizens, civil society in democratic governance have been in focus since 1990s and the thrust in increasingly on "good governance" as a prerequisite for sustainable development. In India,demands for dignity and claims for land rights have to be coupled together, thereby incorporating the demands and claims of the marginalised sections like the Dalits, rural poor and the indigenous people.For the complete functioning of parliamentary democracy in India, along with the above factors, we not only need an independent, strong, unbiased Election Commission, but a strong judiciary and free and unbiased media. From that precautionary note, addressed at Nehru, by Nehru, urging him not to become a tyrant, we have come a long way. But have we, as a society progressed in a democratic manner? Only time will say.

7.9 Self Assessment Questions

1) Write about the development of democratic elections in India.
2) Discuss the structure and functions of the Election Commission in India.
3) Briefly discuss about the politics- election interface in India.
4) Write a note on electoral reforms in India.

7.10 Suggested Readings

i. Jayal, Niraja Gopal. (Ed.). (2007). *Democracy in India.* New Delhi: Oxford University Press.
ii. Johari, J. C. (1995). *The Constitution of India: A Politico-Legal Study* . New Delhi: Sterling.
iii. Kothari, Rajni. (1970). *Politics in India.* Delhi: Orient Longman.
iv. Morris-Jones, W. H. (1987). *The Government and Politics of India.* Eothen Press.
v. Weiner, Myron. (1989). *The Indian Paradox: Essays in Indian Politics.* Calif: Sage.

পাঠক্রম : 2.2

Unit-8

ভারতে জোট রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা
(Coalition Politics in India : Prospects and Challenges)

বিন্যাসক্রম :

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
৮.২ ভূমিকা
৮.৩ ভারতে জোট রাজনীতির উত্থান
৮.৪ জোট রাজনীতির কারণ
৮.৫ জোট রাজনীতির প্রকারভেদ
৮.৬ জোট রাজনীতির স্থায়িত্ব
৮.৭ জোট রাজনীতির সমস্যা/দুর্বলতা
৮.৮ জোট রাজনীতির সম্ভাবনা
৮.৯ মূল্যায়ন
৮.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
৮.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বহুদলীয় ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। নানান বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা পালন করছে। স্বাভাবিকভাবে ১৯৭০ দশকের পর থেকে জোট রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতর অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত। এই এককটির মাধ্যমে ভারতে (কেন্দ্রীয় স্তর) জোট রাজনীতির ইতিবৃত ও সমস্যা সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে। কোয়ালিশন একটি লাতিন শব্দ যা দল বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে জোট বা ইউনিয়ন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে, বিশেষত কিছু অস্থায়ী এবং নির্দিষ্ট কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্য এবং স্বার্থ অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত একটি বহুদলীয় সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি তখনই জোট গঠন করতে বাধ্য হয় যখন তাদের প্রত্যেকের সক্ষমতা অতিক্রম করে সরকার গঠন করা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এইভাবে একটি জোট অন্যান্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি থেকে পৃথক হয়ে যায়।

৮.২ ভূমিকা

উত্তর-ঔপনিবেশিক (এবং অ-পশ্চিমা) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মধ্যে ভারতই প্রতিযোগিতামূলক বহু দলীয় ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভারত স্বাধীনতার সাত দশক পূর্ণ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তার গণতান্ত্রিক বিকাশের এক নতুন

অধ্যায়ের সূচনাও করেছে। কংগ্রেস দলের আধিপত্যের পতন রাজনৈতিক বৈচিত্র্য এবং প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থার স্থায়িত্ব একটি নতুন পর্বের সূচনা করে যার ফলে জোট সরকার একটি অপরিহার্য প্রয়াজনীয়তা হিসাবে দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতে জোট রাজনীতির সাফল্য নির্ধারণে সহায়তা করে এমন উপাদানগুলি চিহ্নিত করা এবং গণতন্ত্রের একত্রীকরণের মডেলের (consociational model) বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তার সাযুয্য বিচার আবশ্যিক হয়ে ওঠে কারণ বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের (democratic governance) সমস্যাগুলির সমাধানের একটি সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময়ই ভারতের শাসনকর্তৃত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কুক্ষিগত ছিল। দুটি সংক্ষিপ্ত সময়কালকে বাদ দিলে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল অবধি জাতীয় কংগ্রেস সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা ভোগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থার কারণে জন-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ মধ্যবর্তী সময়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনতা পার্টি সরকার গঠন করে। ১৯৮৯ সালে জনতা দলের নেতৃত্বে জাতীয় ফ্রন্ট বামফ্রন্টের সহযোগিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করে দু-বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ১৯৯১ সালে কোনোও পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারায় কংগ্রেস পিভি নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে। এই সরকার অবশ্য পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

১৯৯৬-১৯৯৮ সালটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অস্থিরতার যুগ। এই সময় একাধিক স্বল্পসময়ের জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য বিজেপি সরকার গঠন করে। তারপর কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) ক্ষমতা দখল করে। এই সরকারই ভারতের প্রথম পূর্ণ সময়কালের অকংগ্রেসি সরকার। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) লোকসভায় বিপুল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে এবং বিজেপি-বিরোধী বাম সাংসদদের সহায়তায় সরকার গঠন করে। ইউপিএ ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি দলের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) লোকসভায় বিপুল সংখ্যাক আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচনী ফলাফল একদল আধিপত্য ভিত্তিক বহুদলীয় ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। যেখানে জোট সরকার গঠিত হলেও একটি দলের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৮.৩ ভারতে জোট রাজনীতির উত্থান :

পূর্বেই উল্লিখিত যে বৈচিত্র্য মন্ডিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বহুত্ববাদী প্রবণতার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, সাধারণভাবে জোট-রাজনীতি রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল বা অস্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়। ভারতে স্বাধীনতার পূর্বেই সকল রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নানান মতভেদ থাকা সত্বেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করে। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন কিছু হিন্দুত্ববাদী দল ভারত ছাড়ো আন্দোল বা ক্যাবিনেট মিশনের সময় ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করেছে বলে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আবার কিছু মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারী দল নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারত বিভাজনের পক্ষে ছিল বলে প্রমাণিত এবং যারফলে পাকিস্তান গঠন। তবে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন থেকে ১৯৩৫ সালের আইন অবধি এবং স্বাধীনতার অদ্যবধি পর অবধি অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং স্বাধীনতার পর দেশ বা জাতি গঠনে জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যার অন্যতম উদাহরণ অসহযোগ বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং গণপরিষদের গঠন।

পরাধীন ভারতে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে নির্বাচনের পর জোট সরকার গড়ে ওঠে, সম্ভবত ঐ জোট সরকারই আধুনিক ভারতে জোট সরকার গঠনের ইতিহাসে প্রথম জোট তবে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় রাজা ও জমিদারদের

সঙ্গে মিলে মহারানীর ভারত শাসনকেও আধুনিক ভারতে জোট রাজনীতির উত্থান বলে পরিগণিত করেছেন। সামগ্রিকভাবে ভারতে জোট রাজনীতির উত্থান হিসাবে রাজনৈতিক টীকাকারগণ ১৯৪৬ সালে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে চিহ্নিত করেন। উক্ত সরকারে কংগ্রেস (৬জন), মুসলিম নীগ (৫ জন), অকালী দল (১ জন), ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায় (১ জন) ও পারসী সম্প্রদায় (১জন) নানান রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে ১৪ জনের নাম ছিল। তবে স্বাধীনতা লাভের পর মূলত ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনের পর ভারতব্যাপী কংগ্রেসের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি অবধি উক্ত আধিপত্য বজায় থাকে। তবে ১৯৬৭ সালের পর থেকেই অর্থাৎ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই ভারতে প্রকৃত জোট রাজনীতির উত্থান ও জনপ্রিয়তা বৃদিধ পায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১, ১৯৭৮-৮০, ১৯৮৯ এবং তৎপবর্তী সময় ভারতে জোট রাজনীতি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এবং করে চলেছে।

৮.৪ জোট রাজনীতির কারণ :

১৯৬০-এর দশকের পর থেকেই ভারতে, রজনী কোঠারী বর্ণিত কংগ্রেস সিস্টেম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধ ও ভারতের বিপর্যস্ত অবস্থা অর্থনৈতিক অস্থিরতা, জওহরলাল নেহেরু মৃত্যু, কংগ্রেসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজন, রাজ্যগুলিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের যে সার্বজনীক প্রাধান্য ছিল তা খন্ডিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে যে পরিসর উন্মুক্ত হয় তা জোট রাজনীতির পথ প্রস্তুত করে। এই প্রেক্ষিতেই ভারতে জোট রাজনীতির উত্থানের কারণগুলি চিহ্নিত করা যায়;

প্রথমত : ১৯৬৭ পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতি পূর্বেই উল্লিখিত যে, ৬২ সালের যুদ্ধ ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসে, সেই সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যু বা তার পরলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু কংগ্রেসের মধ্যেই অস্থিরতা তৈরি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দারিদ্রতা, খাদ্য সংকট (কিছু রাজ্যে) কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার বণ্টনে সমস্যা বা সমন্বয়ের অভাব, পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ, ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানান পরিবর্তন, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি নানান ইস্যুতে কেন্দ্রীয় (কংগ্রেস) সরকার সমস্যায় পড়ে। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইন্দিরা সমর্থক ও সংগঠকের বিরোধ বিপর্যস্ত হয়। এহেন ঘটনাক্রম রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস একাধিপত্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে এবং ছোট আঞ্চলিক দলসহ কেন্দ্রে বিরোধী দলগুলিকে বৃহত্তরর রাজনৈতিক পরিসর প্রদান করে। স্বাভাবিকভাবেই জোট রাজনীতির পথ প্রশস্থ হয়। অন্যভাবে বলা যায় ১৯৬৭ সালের পর থেকে কংগ্রেস দলের পতন ও বিরোধী শক্তি গুলির কার্যকরী উত্থান এক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারকে ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত : ১৯৭১-এর নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও INC(R) এর বিরুদ্ধে INC(O) ভারতীয় জনসংঘ এবং সংঘবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দল জোট গঠন করে। তবে ৭১-এ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের জয় হয়। এই প্রেক্ষিতে উক্ত জোট ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পরাজিত হয়। তবে সমাজবাদী দলের (ভারত) নেতা রাজ নারায়ণ ১৯৭১ সালের ভোটে কারচুপির জন্য ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। উক্ত মামলায় ইন্দিরা গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হন। স্বাভাবিকভাবেই নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে ১৯৭৫ সালে জাতীয় জরুরি অবস্থাজারী হয়। সারা ভারতব্যাপী গড়ে ওঠা নানান আন্দোলনের নেতা -নেত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিরোধী কণ্ঠ আরোও শক্তিশালী হয়। ১৯৭৭-এর জানুয়ারিতে জরুরি অবস্থা তুলে দিয়ে নতুন নির্বাচন ঘোষিত হয়। জরুরি অবস্থার কালো দিন গুলিকে নির্বাচনে সামনে রেখে জোটের পথ প্রস্তুত করে বিরোধী দলগুলি।

তৃতীয়ত : জনতা দলের উত্থান :- দূর্নীতি, দারিদ্র, ইন্দিরা গান্ধীর অপশাসন প্রভৃতি কিছু ইস্যু তৈরি করে জনতা দলের নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন শানিত হতে থাকে। যার প্রভাব ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পড়ে। মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইতিহাস রচিত হয়। গঠিত হয় প্রথম নির্বাচিত জোট সরকার, তখনই সম্ভবত একদল প্রাধান্য বিশিষ্ট্য বহুদলীয় ব্যবস্থার পতন হয় এবং শুরু হয় জোট সরকারের যুগে।

চতুর্থত- আঞ্চলিকতাবাদ : একথা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেস দলেরর ক্ষমতা খর্ব হওয়ার প্রেক্ষিতেই জোট রাজনীতি বা সরকারের প্রাসঙ্গিকতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু ভারতের বহুত্ববাদী সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং অঞ্চলকেন্দ্রিক রাজনীতিও জোট রাজনীতির অন্যতম কারক। এক্ষেত্রে নানান উপাদান পরিলক্ষিত যেমন দক্ষিণ ভারতে বর্ণ উচ্চ ও নীচ তথা জাতি গোষ্ঠী উত্তরাঞ্চলে জাত-পাত উত্তর-পূর্ব দলিত সম্প্রদায়। মধ্যভাগেই তাই পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় বঞ্চনাও বিশেষ আঞ্চলিক (ভৌগোলিক) বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে কেন্দ্র করে নানান আঞ্চলিক দল রাজ্যগুলিতে প্রাধান্যশীল হয়ে ওঠে। যার প্রভাব জোট রাজনীতিতে পরিলক্ষিত হয়। এবং জোট রাজনীতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত : বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন : ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভা নির্বাচনেই ধরা পড়ে যে কংগ্রেসের অবিস্যবাদিত ক্ষমতার পতন ঘটতে শুরু করেছে। তার প্রভাব বা ইঙ্গিত বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়। তবে তার আগেই ১৯৫৪ সালে কেরালায় CPI-এর নেতৃত্বধীন জোট সরকার গঠিত হয়েছে। তবে বাম জোট সেই ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি। উল্টোদিকে কংগ্রেসও জোট গঠন করেছে (UDF-সংযুক্ত গণতান্ত্রিক জোট)। দেখা গেছে বাম জোট (LDF-বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট) বা কংগ্রেস জোট নানান সময়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে। তবে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে জোট সরকারের সূত্রপাত হয় তা এক ইতিহাস তৈরি করে। ১৯৭২-৭৭ সাল বাদ দিলে ২০১৬ অবধি পশ্চিমবঙ্গে জোট সরকারই কাজ করেছে। তার মধ্যে ২০১১ অবধি এবং ২০১৬-র পরে কংগ্রেস বিরোধী জোটই গুরুত্ব পেয়েছে। একইভাবে ১৯৬৭ সালে বিহারেও অকংগ্রেসী জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিহারে দলত্যাগের ঘটনা অতিরিক্ত হওয়ার কংগ্রেস ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস মূল দল হিসাবে সরকার গঠন করে। অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে ওড়িশায় পঞ্জাবেও জোট সরকার গঠিত হয়। এছাড়াও ১৯৭০-এর দশকে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামলিনাড়ুতে অকংগ্রেসী জোট গঠিত হয়। বর্তমানেও একই ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৮.৫ জোট রাজনীতির প্রকারভেদ :

যে কোনো রাজনৈতিক দলের জোট সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এই জোট গঠন মোটামুটি দুধরনে (১) প্রাক-নির্বাচনী জোট এবং (২) নির্বাচন উত্তর জোট। প্রথম ক্ষেত্রে জোট হওয়ার আগে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (NDA) বা ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (UPA)। বর্তমানে NDA সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করেছে। এর আগে আমরা UPA-I ও II এর সরকার দেখেছি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, যদি নির্বাচনের পর কোনো দল বা জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না, তখন সেই দল বা জোট অন্য দলের বা জোটের সহায়তা প্রার্থনা করে বা অন্য দল জোটে যোগদান করে। যেমন ২০০৪ সালে UPA জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হয়। সেই সময় বামপন্থী দলগুলি সরকারের বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করে। ফলে UPA-I সরকার গঠিত হয়। আবার ২০০৮ সালে বামপন্থী দলগুলি ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তির প্রশ্নের সরকার থেকে সরে যায়, তখন আস্থা বোঠে সমাজবাদী দল UPA-I এ যোগদান করে। অর্থাৎ নির্বাচন উত্তর জোটে ক্ষমতায় আসা ও টিকে থাকা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এইদিক দিয়ে বিচার করলে জোট রাজনীতির তৃতীয় স্তর বা ধরন চিহ্নিত করা যায়। জোট হল সংসদীয় স্তরে জোট।

অন্যদিকে দলগত অবস্থান থেকে জোট রাজনীতিকে একদল প্রাধান্য ভিত্তিক জোট এবং সংখ্যালঘিষ্ট জোটে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বাকি দলগুলিকে সরকারি দল হিসাবে মর্যাদা দেয় এবং জোটকে সরকারি জোট বা জোটের সরকর হিসাবেই অ্যাখ্যায়িত করে। যেমন ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনতা দল (BJP) একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু প্রাক ভোট জোট তথা NDA সরকার গঠন করে।

অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ জোট বলতে সেই জোটকে বোঝায় যেখানে কোনো দলই সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না। অনেকগুলি দলের মধ্যে আসন বণ্টন হয়। যেমন ১৯৮০-র দশকে ন্যাশনাল ফ্রন্ট (National Front) যেখানে জনতা দল, ডি এম. কে., টি.ডি.পি, কং (এস), এজিপি মিলে জোট গঠন করে এবং বি জে পি ও বামপন্থী দলগুলি সরকারের বাইরে থেকে উক্ত ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করে।

আবার সময়কাল তথা স্থায়িত্বের প্রশ্নে জোট সরকারের প্রকারভেদ করা যায়। যথা—স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, কার্যকরি, অকার্যকরি এবং দুর্বল। উক্ত সবকটি বিভাজনই জোট সরকারের স্থায়িত্ব ও কার্যকরি ভূমিকার প্রেক্ষিতে সম্পাদিত। যে জোটে একটি দলের প্রাধান্য থাকবে বা একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকবে সেই জোট স্থায়ী ও কার্যকরি হয়ে থাকে। যেমন NDA সরকার (২০১৪ ও ২০১৯)। অন্যদিকে যে জোট সংখ্যালঘিষ্ঠ তথা যে জোটে কোনো দলেরই প্রাধান্য নেই সেই জোট ক্ষণস্থায়ী, অকার্যকরি বা দুর্বল হতে বাধ্য। যেমন অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৩ দিনের NDA সরকার বা দেবগৌড়ার নেতৃত্বে প্রায় এক বছরের ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার।

৮.৬ জোট রাজনীতির স্থায়িত্ব :

ভারতের জটিল আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং সেই প্রেক্ষিতে নানান পরিচয় প্রধান আঞ্চলিক রাজনীতি জোট সরকারকে অনিবার্য করে তুলেছে। একদিকে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যদিকে বঞ্চনার অভিযোগ সেই সঙ্গে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকারের প্রসঙ্গ প্রভৃতি জোট সরকার প্রাসঙ্গিকতাকে চ্যালেঞ্জ করলেও ১৯৯৯ পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে জোট সরকারই অনিবার্য এটি প্রমাণিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে একদল প্রাধান্যকারী জোট অন্যতম নির্ধারকের ভূমিকা পালন করছে। যা হোক, ১৯৭৭ সালে ভারতে প্রথম জোট সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। মোরারজি দেশাই এরনেতৃত্বে ভারতীয় জল সংঘ, কংগ্রেস (ও) ভারতীয় লোক দল, সংঘবদ্ধ সমাজ তান্ত্রিক দল প্রভৃতি মিলে একটি জোট সরকার গঠন করে। কিন্তু সেই জোট মাত্র ৮৫৭ দিন ক্ষমতাসীন ছিল। এর পর ১৯৭৯ সালে চরণ সিং এরনেতৃত্বে ভারতীয় লোকদল ক্ষমতাসীন হয়। তিনি ২৩০ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সমর্থন তুলে নিলে ২০শে অগাস্ট ১৯৭৯ পদত্যাগ করেন। অর্থাৎ এই জোটের বয়স হয়েছিল মাত্র এক মাসের কম। কিন্তু তিনি জানুয়ারি ১৯৮০ অবধি কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তথা কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠদল হিসাবে ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৮৯ সালে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে জনতা দল থেকে সমর্থন করে। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দলত্যাগ করলে Nation Front সরকার ভেঙে যায়। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৩৪৪দিন ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৯০ সালেই কংগ্রেসের সমর্থনে চন্দ্রশেখর এর নেতৃত্বে জোট সরকার গঠন করা হয়। ঐ সরকার মাত্র ২২৩ দিন তথা প্রায় সাত মাস ক্ষমতাসীন ছিল। পরবর্তী জোট সরকার গঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। কারণ মাঝের সময়ে কংগ্রেস দল নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার চালায়। ১৯৯৬-এর মে মাসে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বি জে পি ১৬১টি আসন নিয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু ঐ সরকার মাত্র ১৩ দিন স্থায়ী হয়। কারণ বাজপেয়ী আস্থা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।১৯৯৬-এর জুন মাসে এইচ.ডি. দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনে জোট গঠন করে। কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করে। কিন্তু ৩২৫ দিন সরকারের থাকার পর কংগ্রেস দেবেগৌড়া সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিলে উক্ত জোট সরকারের পতন ঘটে। এরপর ১৯৯৭ সালে ৩৩৩ দিনের জন্য আই. কে. গুজরালের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস পুনরায় বাইরে থেকে সমর্থন করে এবং সমর্থন তুলে নিলে গুজরাল সরকারের পতন ঘটে। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে ১৮২টি আসন নিয়ে বি জে পি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আঞ্চলিক দলগুলির সহায়তা নিয়ে NDA সরকার গঠন করে। কিন্তু ১৩ মাস ক্ষমতায় থাকার পর ASIDMK দল NDA থেকে সমর্থন তুলে নিলে সরকারের পতন হয়। পরের নির্বাচনে ১৯৯৯ সালে পুনরায় ১৮২টি আসনে জয়লাভ করে অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সাথে জোটকরে পূর্ণ সময়ের জন্য সরকার পরিচালনা করে। এরপর ২০০০ থেকে ২০১৪ সাল অবধি কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে UPA-I ও II সরকার দুবার পূর্ণ সময়ের সরকার পরিচালনা করে। মাঝে ২০০৮ সালে UPA-I থেকে বামপন্থী দলগুলি সমর্থন তুলে নিলে

জোট সরকার টালমাটাল হয়ে যায়। তবে আস্থা ভোটে সমাজবাদী দল UPA-I-কে সমর্থন করলে জোট টিকে যায়। ২০১৪ থেকে জোট রাজনীতিতে নতুন ঝোঁক দেখা যায়। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বি.জে.পি. একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে NDA-I ও II সরকার গঠন করে। জোট সরকার গঠিত হলেও বি.জে.পি.-এর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণুতা জোট রাজনীতির আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। একদলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাযুক্ত জোট, শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব, আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট করে অধিকাংশ রাজ্যে বি.জে.পি. জোট সরকার বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বি.জে.পি ক্ষমতাসীন থাকায় জোট রাজনীতির চর্চায় ঝোঁক একদল প্রাধান্যকেন্দ্রিক চর্চায় পর্যবসিত হয়। নিম্নচিত্রিত তালিকার মাধ্যমে জোট সরকারগুলির বিবরণ তুলে ধরা হল—

ক্রম.	জোট	জোট সঙ্গী	আসন	সময়কাল	প্রধানমন্ত্রী
১.	জনতা জোট	কংগ্রেসকে এক ডেমোক্রেসী) ভারতীয় জনসংঘ, লোকদল, সি.পি.আই.(এম) অকালি দল প্রভৃতি	৩৫৪	২ বছর চার মাস ২৪শে মার্চ ১৯৭৭ ২৮শে জুলাই ১৯৭৯	মোরারজি দেশাই*
১এ	লোকদল	কংগ্রেস (এস), কংগ্রেস (আই) বাইরে থেকে সমর্থন করে	---	২৩ দিন, মে, ১৯৭৯	চরণ সিং**
২	জাতীয় ফ্রন্ট	জনতা দল, টিডিপি, ডিএমকে, কং (এস), (এস), অ.গ.প [বি.জে.পি ও সি.পি.আই (এম)] বাইরে থেকে সমর্থন করে	২৫৯	৩০ দিন ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ১৯৮৯-১০ নভেম্বর ১৯৯০	ভি. পি. সিং
২এ	জনতা দল	কংগ্রেস (আই) বাইরে থেকে সমর্থন করে	---	২৩ দিন ১০ নভেম্বর ১৯৯০ ২১জুন ১৯৯১	চন্দ্রশেখর
৩	যুক্তফ্রন্ট	জনতা দল, সি.পি.আই., কংগ্রেস (টি) ডিএমকে টিডিপি প্রভৃতি (কংগ্রেস (আই) ও সি.পি.আই (এম) বাইরে থেকে সমর্থন করে।	৩২৬	৩২৫ দিন ১লা জুন ১৯৯৬ ২১শে এপ্রিল ১৯৯৭	এইচ ডি দেবেগৌড়া
৩এ	দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট		এরপর	৩৩৩ দিন ২১শে এপ্রিল ১৯৯৭ ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭ গগগ	আই. কে গুজরাল
৪.	বি.জে.পি জোট	বি.জে.পি. এস.এ.ডি, শিবসেনা AAIDMK, BJD লোকশক্তি জনতা দল, প্রভৃতি (টি.ডি. পি ওতৃণমূল কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করে।	২৮৬	১৩ মাস ১৯ মার্চ ১৯৯৮ ১৭ই এপ্রিল ১৯৯৯	অটল বিহারী বাজপেয়ী
৫	এন.ডি.এ	বি. জে. পি সমতা পার্টি, AAIDMK শিব সেনা, বি.জে.ডি	২৯৮	পূর্ণ সময়, ১৯৯৯ থেকে ২২শে মে ২০০৪	অটলবিহারী বাজপেয়ী
৬.	ইউপিএ-১	কংগ্রেস (আই) বহুজন সমাজবাদী দল, বামপন্থী দলগুলি বাইরে থেকে সমর্থন,	২৭৩	পূর্ণ সময় ২৪শে মে ২০০৪ ২২শে মে ২০০৯	মনমোহন সিং
৭.	ইউপিএ-২	বহুজন সমাজবাদী দল, টি. আর. এস. পি. এস. কে. AAIDMK, TMC (২০১২) প্রভৃতি (নানান সময় নানান দল সমর্থন তুলে নিয়েছে	২৬২	২১শে মে ২০০৯ ২২শে মে ২০১৪	
৮	এনডিএ -১	বি.জে.পি, শিবসেনা, লোক জনশক্তি দল, শিরোমনি অকালি দল অন্যান্য দল প্রভৃতি	২৮২	২৮শে মে ২০১৪ ৩০শে মে ২০১৯	নরেন্দ্র মোদী
৯.	এনডিএ-২	(শিবসেনা, ২০১৯ ও অকালি দল ২০২০ সালে জোট ত্যাগ করে)		৩০শে মে ২০১৯ অদ্যবধি	

* ভোট হয়নি, জোটের মধ্যে থেকেই নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে।
** কংগ্রেস (আই) ও কংগ্রেস (এস) এর সমর্থনে চরণ সিং ক্ষমতাসীন হন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী পরে চরণ সিং এর সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেন। ইতিমধ্যে সিং রাষ্ট্রপতি নীলম এস. রেড্ডির কাছে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সমর্থন দেন। পক্ষান্তরে এই পরামর্শের বিরোধীতা করে জনতা দলের জগজীবন রাও আস্থা (ভোট) অর্জনের জন্য দাবি করেন। কিন্তু লোকসভা ভেঙে যায়। ফলে চরণ সিং ১৯৮০ সালে জানুয়ারি অবধি কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

জোট রাজনীতি তথা সরকারের কার্যকাল এবং সেই সময়কার ঘটনাক্রম বিচার বিশ্লেষণ করে একথা আপেক্ষিকভাবে বলা যায় যে জোট সরকার মূলত ক্ষণস্থায়ী ও অকার্যকরি সরকার। কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনী ফলাফল এবং ২০০৪ থেকে ২০১৪ অবধি জোট সরকারের সাফল্য অবশ্য স্থায়িত্ব ও অনিবার্যতার উদাহরণ স্বরূপ, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, কোনো আঞ্চলিক দল বা তৃতীয় ফ্রন্ট (যেমন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট) স্থায়ী হতে পারে নি কংগ্রেস বা বিজেপি সেখানে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে কেবলমাত্র সেখানেই জোট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। একই সঙ্গে ভোটের আগে জোট বা প্রাক নির্বাচনী জোট, ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি (common Minimmum programme) দলগুলির মধ্যে তথা জোট সঙ্গীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন , সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপক, প্রধানমন্ত্রী ও দলনেতার ভূমিকা প্রভৃতি উপরেও জোট সরকারের স্থায়িত্ব বা কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

৮.৭ জোট রাজনীতির সমস্যা/দুর্বলতা :

ভারতে গত দুই দশক ধরে জোট রাজনীতি তথা জোট সরকার এক অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যেতেই পারে যে জোট সরকারই ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত। এযাবৎকাল ভারতে নানান জোট সরকার গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা তথা সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা—

প্রথমত : জোট সরকারের স্থায়িত্বের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যৌথ দায়িত্বশীলতা। ঐক্যমত এবং গোপনীয়তা রক্ষা কবা। কিন্তু জোট সরকারের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে এই বিষয়গুলিকে বজায় রখার বা প্রতিপালন করার ব্যর্থতা জোটের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে। জোট সরকারের দলীয় এবং নেতাদের স্বার্থই গুরুত্ব পেয়েছে। কতগুলি উদাহরণে তা আরও স্পষ্ট হবে। ভি.পি.সিং সরকার যখন বিজেপি-এর রথযাত্রার বিরুদ্ধে গিয়ে আদবানিকে গ্রেপ্তার করে, তখন বি জে পি জাতীয় ফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং জাতীয় ফ্রন্ট জোটের পতন ঘটে। আবার আই কে গুজরাল যখন তার জোট সঙ্গী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় সি.বি.আইকে তদন্তের অনুমতি দেয় তখন তাঁর জোট সরকার টালমাটাল হয়ে পড়ে। একইভাবে তাঁর শাসনকালে উত্তর প্রদেশে (বি.জে.পি শাসিত) রাষ্ট্রপতি শাসন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেই সংক্রান্ত মামলায় হার কিংবা রাজীব গান্ধীর হত্যার প্রেক্ষিতে জৈন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তির গুজরালের জোট সঙ্গী ডি.এম.কে-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এবং সেই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস (আই) এর জোট সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেওয়া প্রভৃতি উপরিক্তি (পূর্বোক্ত) বক্তব্যের পক্ষে অন্যতম উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত : জোট রাজনীতিতে সব সময় একটা অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ আমলাতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। এহেন ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে আমলারা গোষ্ঠী চেতনায় নিজেদের পদমর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে জন পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ শ্লথ হয়ে যায়। সার্বিকভাবে লাল ফিতের বাঁধন তৈরি হয় বলে গবেষকগণ মনে করেন।

তৃতীয়ত : বিভিন্ন দলীয় স্বার্থের সমন্বয়ে জোট তৈরি হলেও পুরোনো অভিজ্ঞতা দেখা গেছে দলীয় স্বার্থের সংঘাতে জোটে সমস্যা দেখা দেয় এবং সরকারি কাজ ব্যহত হয়। যেমন, অটল বিহারী বাজপেয়ীর সংখ্যালঘু জোটে AIADMK-এর সুপ্রীমো জয়ললিতা জোটে থেকে দাবী করেন যে তার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা করেছে তা যেন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় জোট সরকার তা না করলে জয়ললিতা জোট ত্যাগ করেন।

চতুর্থত : সাধারণত জোট সরকারের আঞ্চলিক দলগুলি প্রাধান্যশীল হওয়ায় আঞ্চলিক স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পায় এবং জাতীয় স্বার্থ ব্যহত হয় বলে অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন। এর ফলে একই সঙ্গে জোট সরকারের স্থায়ীত্বের বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমত : বিভিন্ন দল তথা মতাদর্শগত পার্থক্য থাকার সত্বেও ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে দলগুলি ঐকবদ্ধ হয়। কিন্তু মতাদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে যদি জোট সরকারের সিদ্ধান্তের পার্থক্য থাকে তখন জোট দুর্বল হয় এমনকি জোট ভেঙের যেতে পারে। যেমন ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তি নিয়ে বামপন্থী দলগুলি তাদের মতাদর্শ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে UPA-I থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে। ২০০৮ সালে তারা সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকার আস্থা ভোটে সমাজবাদী দলের সমর্থন লাভ করলে জোট সরকার টিকে যায়।

ষষ্ঠত : জোট সরকারের অপর অন্যতম সমস্যা কোনো নির্দিষ্ট কার্যকরি নীতি মানার অভাব। এরফলে যখন তখন সমর্থন তুলে নেওয়ার রীতি প্রচলন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকাই অত্যন্ত গুরুত্ব পায়।

সপ্তমত : নির্বাচন উত্তর জোট মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও বিশ্বাস বিরোধী। যখন কোনো দল নিবাচনী লড়াই অন্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে তখন মানুষ যে দলকে পছন্দ করে ভোট দেয়, সেই দল যদি ক্ষমতার স্বার্থে বিরোধী দলের জোটে অংশগ্রহণ করে তখন মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রহসনের সম্মুখীন হয়। যেমন ২০০৪ সালে কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে সমাজবাদী দল লড়াই করলেও। ২০০৮ সালে সেই সমাজবাদী দলই কংগ্রেস জোট তথা UPA-I কে সমর্থন করে।

৮.৮ জোট রাজনীতির সম্ভাবনা :

যতই সমস্যা থাক না কেন, বস্তুত বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজে জোট সরকারই অন্যতম রাজনৈতিক অনিবার্যতা। আরেন্ত লিজপোর্ট ভারতের গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তার সুসংহতকরণ, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, ধর্মীয় প্রভাব, ভাষাগত সমস্যা, জাতপাত ?? সামগ্রিক বহুসংস্কৃতিক চরিত্রকে তুলে ধরে কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি-এর কথা বলে। এই সুসংহতকরণ ও গণতান্ত্রিক বাতাবরণ জোট রাজনীতিকে অবশ্য করে তুলেছে। তিনি আরও বলেন ভারতের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য, সকল ভাষাগত যুক্তরাষ্ট্রীয় বাতাবরণ ঐতিহ্য সেই সঙ্গে সমঝোতামূলক মানসিকতা এককীকরণে উৎসাহ যোগায়। অন্যদিকে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে নাগরিক সংস্কৃতি, সংবিধানিক কাঠামো। কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতিও জোট রাজনীতির অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে। আবার প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থায় দলের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই জোটের বাস্তবতা রয়েছে। অন্যদিকে ভোটারদের তথা নির্বাচকদের আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। যোগেন্দ্র যাদব বলেন, বর্তমানে মানুষ কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার দেখতে চায়। দেখা গেছে কেন্দ্রে তথা লোকসভায় যে রকম ভোট আচরণ হয় তেমনটা বিধানসভা ভোটে হয় না। এই প্রেক্ষিতেই জোট সরকারের স্থায়ীত্বের সম্ভাবনার জন্য কতগুলি শর্তের তথা শর্তপূরণের মাধ্যমে সম্ভবপর। যেমন—

১) সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির মাধ্যমে জোট পরিচালনা।

২) জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

৩) প্রাক-নির্বাচনী জোট প্রস্তুত ও কঠিন শর্ত আরোপ।

৪) মন্ত্রী ও সদস্যদের যৌথ দায়িত্বশীলতা।

৫) জোটে দলগুলির মধ্যে সমন্বয়কারী উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া।

৬) দলীয় প্রধানদের নিয়ে সমন্বয়কারী দল গঠন।

৭) প্রধানমন্ত্রী ও জোটের নেতাদের মধ্যে নিরপেক্ষ আদান-প্রদান প্রভৃতি।

তথাগতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে দলত্যাগ ও জোট গঠন এগুলি ভারতীয় রাজনীতিতে ভীষণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। শ্রীধরণ একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন যে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলিতে ৭৪টি জোট সরকর গঠিত হয় তার মধ্যে প্রাক-নির্বাচনী জোট ছিল ৩১টি বাকী ৪৩টি জোট সরকার দলত্যাগ ও বিভাজনের ফলে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐ সবকটি জোটের মধ্যে মাত্র ১১টি জোট সরকার পূর্ণ সময় ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু কেন্দ্রে দিকেতাকালে দেখা যাবে, ১৯৯৯ পরবর্তী সময় থেকে একদল প্রাধান্য ভিত্তিক জোট সরকার ক্ষমতায় থাকায় তারা পূর্ণ সময় সরকারে ছিল। কিন্তু ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করে দেয় যে ভোটারদের আচরণ পুনরায় নিরঙ্কুষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিতেই ঝুঁকছে। যদি আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের অস্থিত্ব রক্ষার তাগিদেই জোটে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৮.৯ মূল্যায়ন :

ভারতের রাজনীতিতে কখনোই সাধারণ উত্তর-দক্ষিণ মতাদর্শভিত্তিক দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বরং বহুসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমন্বিত বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় প্রাধান্যশীল ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি অঞ্চল কেন্দ্রিকতা, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত প্রভৃতি নানা উপাদান পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তাদের ক্ষমতার জন্য এই প্রসঙ্গগুলিকে রাজনৈতিক তাস হিসাবেও নির্বাচনে ব্যবহার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভোট কোনো নির্দিষ্ট দুটি বা তিনটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে মনে হয় না। তাই জোট রাজনীতি ভারতের ভবিষ্যত বলে গবেষকগণ মনে করেন। একই সঙ্গে দলত্যাগ বা দল বিভাজন ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়ার মানুষের তথা নির্বাচকদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল পছন্দ করায় বিভ্রান্তি তৈরি হয় তা স্বাভাবিকভাবেই ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলে। কারণ ভোটের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই রাজনৈতিক দল অপেক্ষা নেতৃত্বের করিশ্মা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী, তামিলনাড়ুতে প্রয়াত জয়ললিতা, বর্তমানে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী, সুতরাং ভোটের ক্ষেত্রে বহুমুখী লড়াই পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে জোট রাজনীতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ভারতের রাজনীতিতে ৭০-এর দশক থেকে সর্বদাই বহুমাত্রিক ভোট বা নির্বাচনী লড়াই পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধুমাত্র কংগ্রেস-জনতাদল বা কংগ্রেস-বিজেপি বা কংগ্রেস-বামপন্থী দল এই বিভাজন নয় সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই তথা রাজ্যভিত্তিক নির্বাচনী লড়াই। সেই সঙ্গে নেতৃত্বে গুরুত্ব তাতে আরও নতুন মাত্রা যোগ করে। অন্য দিকে ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির উপস্থিতির কারণে জোটের নীতি নির্ধারণে সমস্যা হলেও জোট রাজনীতির অনিবার্যতা রয়েই গেছে।

ক্রমবর্ধমানভাবে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যতা দাবী তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্ত করার দাবী, কিংবা রাজ্যগুলির জনসেবা প্রদানে দায়বদ্ধতার প্রচার; কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাকে সাময়িক বিদেশি সম্পর্ক প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা প্রভৃতিও রাজ্য বা আঞ্চলিক দলগুলিকে প্রাধান্যকারী ভূমিকার অবতীর্ণ করে। যা জোট রাজনীতির পথকেই প্রশস্থ করে। এছাড়াও ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা বিকেন্দ্রীকরণের দাবী, রাজ্যের অর্থনৈতিক দাবী প্রভৃতিও অন্যতম নির্ধারক। একথা অনস্বীকার্য যে বহু সংস্কৃতির ভারতে জোট রাজনীতি ভোটারদের সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে, সুষম উন্নয়নের দাবীকে জোড়ালো করতে, গণতন্ত্রের মূল ভাব জনগণের শাসনকে কার্যকরি করতে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে অনেক গবেষকগণই দাবী করেন।

৮.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী :

a) Write a brief note on the performance of Coalition Government of India.

b) Do you think coalition politics in India is imevitable? Justify your answer.

c) Discuss the beakground for the rise of coalition politics in India.

d) Evaluate the factors for the stability of coalition Government in Indian parliamentary democracy.

e) Analyse the basic problems for the fragility of the coalition Government in India.

f) Discuss the prospects of coalition politics in India.

৮.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

i. Austin, Granville. (1999). *Working of a Democratic Constitution: The Indian Experience.* New Delhi and New York: Oxford University Press.

ii. Chakraborty, Bidyut. (2006). *Forging Power: Coalition Politics in India.* Oxford University Press.

iii. Hasan, Zoya. (Ed.). (2002). *Parties and Party Politics in India.* New Delhi and Oxford.

iv. Kohli, Atul. (Ed.). (1988). *Indian Democracy: An Analysis of Changing State-Society Relations*. Princeton: Princeton University Press.

v. Lijphart, Arendt. (1996). The Puzzle of Indian Democracy: A Consocianal Interpretation. *The American Political Science Review , 90* (2), 258-268.

vi. Singh, Mahendra Prasad., & Mishra, Anil. (Ed.). (2004). *Coalition Politics in India: Problems and Prospects* . New Delhi: Manohar.